[কতিপয় সন্দর্ভ]

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত।

—:*:—

কাঁঠালপাড়া
"সাহিত্য সম্মিলনী" হইতে প্রকাশিত।

চুঁচুড়া "মহামায়া" মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্রে
শ্রীঅমূল্য রতন বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা।

ইহলোকে যিনি আমার জনয়িতা ও পালয়িতা

পরলোকে যিনি আমার রক্ষয়িতা ও পরিত্রাতা,

সেই আজন্ম পুণ্য প্রথিত

বরেণ্য মহাগুরু

পিতৃদেবের

পবিত্র পদ কমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিয়া

আমার মানব জীবনের

মহা-অর্ঘ্য সম্পন্ন

করিলাম।

দীনহীন— রামসহায়।

এই নবীন লেখক তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হস্তে লইয়া ভয়ে ভয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছেন। এ ভয় অকারণ নহে, তাঁহার পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে — অনেক প্রতিবন্ধক; তিনি নিজের প্রাপ্য চাহিতেই কুণ্ঠিত! কেন না নিজের শক্তির উপর এখনও তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই; আবার অনেক স্থলে ব্যাধির অপেক্ষা, বটিকা সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়, এই জন্য নবীন লেখকের পক্ষে সাহিত্য পথ সরল নহে। কিন্তু আমি এই ভয় বিহ্বল রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়কে আশ্বস্ত করিতেছি। তাঁহার ভয় কি? গ্রন্থ লিখিয়া যিনি যশের প্রত্যাশী, বা অর্থের প্রয়াসী, তিনি হতভাগ্য; সমালোচকের দোদুল্যমান্ খড়্গাতলে সোদ্বেগচিত্তে, বিনিদ্র নয়নে, তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কাব্যতীর্থ মহাশয় যশ কিম্বা অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাঁহার সে বিড়ম্বনার প্রয়োজনও নাই।

বঙ্গভাষা — রাজভাষা নহে, অর্থ উপার্জ্জনের ভাষা নহে, সম্মান লাভের ভাষাও নহে, বঙ্গভাষা কেবল মাতৃভাষা। বঙ্কিম বাবুর কথায় বলি — বঙ্গভাষায় যিনি যাহাই লিখুন — তাহা মাতৃপদে অঞ্জলি। বালক রামসহায় বাগ্বাদিনীর পদে যে আত্ম সমর্পণ

করিয়াছেন—তাহা দুঃসাহসের পরিচায়ক নহে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-কালেই জগতের উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণই বাঙ্গালাভাষাকে গঠন করিয়াছেন—মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার জন্মদাতা। কিন্তু অতুল ক্ষমতা সত্ত্বেও বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে ধর্ম্মভাব জাগাইবার জন্য তিনি অবসর পান নাই। কারণ—কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যই গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে যে দিন ধর্ম্মভাব ছিল, কবি সে দিন "ইছাই ঘোষের কাটা মাথা জোড়া" দিতে পারিতেন, লখিন্দরের গলিত জীর্ণ শবদেহে—পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, হনুমানের কক্ষতলে দীপ্তিমান্ সূর্য্য দেবকেও লুকাইয়া ফেলিতেন।

রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অবকাশে"—সেই ধর্ম্মভাব দেখিয়া, আজ আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। তেজস্বী ঋষির বেদান্ত উপনিষদের তীব্রতড়িৎ, কৃশ বাঙ্গালীর কোমল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটীও অনুপযুক্ত উক্তি নাই, সুরুচি বিরুদ্ধ এমন একটি মাত্রও শব্দ নাই—যাহা নির্ব্বিঘ্নে পাঠ না করা যাইতে পারে। রামসহায় বাবুর রচনায় একটু জাতীয় ভাবের মধুর আভাষ পাওয়া যায়। লেখক তরুণ বয়সে, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের "হা হুতাস" ত্যাগ করিয়া, জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া, একটু গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সাহিত্য, লেখকের এক রকম আত্ম প্রকাশ, নিজের রচনায় লেখকের আত্ম প্রবৃত্তির কোনও অংশ থাকেই থাকে। প্রবৃত্তির

দীপ্তিশালী চিত্র হইতে, রামসহায়ের নিবৃত্তির করুণ ছবি—তাই আমার ভাল লাগিয়াছে।

শুনিয়াছি—তাঁহার "আত্রেয়ীর দীক্ষা" বঙ্গবাসী পত্রে প্রশংশিত হইয়াছে। সেই ভরসায় "অবকাশ" প্রচারিত হইল। তারপর—যদ্বিধের্মনসিস্থিতং। "অবকাশের" প্রথমে যে কয়টি সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহা উদ্ভট শ্লোক নহে—রামসহায় বাবুর স্ব রচিত।

প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই পূর্ব্বে কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের বন্ধুবর্গের অনুরোধে—"অবকাশে" তাহা একত্র সংগৃহীত হইল। রায় শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুরের আগ্রহে "অবকাশ" নামে গ্রন্থের নাম করণ হইল।

এই প্রেম প্লাবিত বঙ্গে—আদিরসের কবিতার চেয়ে, এইরূপ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনিতা আছে, তাই সংক্ষেপে "অবকাশের" পরিচয় দিলাম।

চুঁচুড়া
১০ই আশ্বিন ১৩১৮।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।
ভূতপূর্ব্ব "বহুদর্শী" সম্পাদক।

শুদ্ধি-পত্র।

[অবকাশে অনেকগুলি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। সকল-গুলি সংশোধন করা সম্ভব নহে। যে গুলি মারাত্মক ভুল—নিকে ল মাত্র সেই গুলির উল্লেখ করা গেল।—লেখক।]

অশুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	শুদ্ধ
প্রশংশিত	৵০	৩	প্রশংসিত
সত্বা	১০	২	সত্তা
অগ্নিপিণ্ড গুরুত্ববান্	১৩	১৯	অগ্নিপিণ্ডো গুরুত্ব
আচ্ছন্নবদ্ধ	৩২	৩	আচ্ছন্ন, বদ্ধ
সাম্রাজ্ঞী	৭৪	১৯	সম্রাজ্ঞী
শমণ	৭৮	২০	শমন
নিমাক্ষনমুখী	৮০	৬	নিম্নকক্ষ-সমুখী
আখি	৮২	১৩	আঁখি
অণুপ্রাণীত	৮৪	১০	অণুপ্রাণিত

৪৪ পৃষ্ঠার ৪, ৫, ৬ এই তিনটী পংক্তি, ১৯ পংক্তির পরে বসিবে

অবকাশ।

গাথা।

(১)

ভ্যাস্থেনাস্থমতস্থ যস্থ ন ভবত্যব্যাপ্তি সন্ত.বনা,
নো যৎ সৎপ্রতিপক্ষতা ন চ হি বা যস্থাস্ত্বসিদ্ধিস্তথা।
হীনোপাধিরবাধিতো বিরহিতো দোষৈর্বিরোধাত্মকৈঃ
সদ্ধেতুঃ স চ কোঽপি সম্প্রতি ময়া সঞ্চিন্ত্যতে সন্ততং॥

(২)

সার্দ্ধং যাদঃপতিতনয়য়া সারদায়া বিবাদো
বাদো যোঽয়ং চরতি নিতরামেষ মিথ্যাপবাদঃ।
যস্মাদ্ বাণীং ন কিমু কমলা কণ্ঠদেশে দধাতি
শ্রীহীনা বা কচিদপি পুন র্ভারতী কিং মু ভাতি।

(২)

ভারতীর সনে নিত্য লক্ষ্মীর বিবাদ
এ কেবল নিন্দুকের মিথ্যা অপবাদ।
যে হেতু, নহে কি ভাষা ইন্দিরার কণ্ঠভূষা,
আর এই বিশ্বমাঝে মুহূর্ত্তের তরে
কে দেখেছে শ্রীবিহীনা দেবী ভারতীরে?

(৩)

মাতর্গঙ্গে! সুবিমল পয়ো-দর্পণে বিম্বিতস্তে
ভূতে ভূতে সমরসইব স্বানুরূপঃ স্বভাবঃ।
গৌরী শ্যামা* তব চ সলিলে মজ্জতী যা চকাস্তি
দৃষ্টৈবং তে প্রভবতি রতিঃ কীদৃশোঽয়ম্বিবাদঃ॥

(৩)

মাতর্গঙ্গে! সুনির্ম্মল সলিল দর্পণে
কি করুণা উছলয় সর্ব্বভূতে বরিষয়,
বিম্বিত স্বভাব তব রয়েছে কেমনে!
তব জলে স্নান করে হরষ আননে
গৌরি শ্যামা দিবা রাতি, হেরি তা নয়নে।
তুমিও তাদের সঙ্গে কত না আনন্দে রঙ্গে
খেলা কর নাচি নাচি, তবে মা কেমনে—
হইল কলহ তব গৌরী শ্যামা সনে?

(৪)

হরসি মম মনস্ত্বং প্রেমবাক্যৈরুদারৈ—
রথচ বহসি তত্তদ্দুঃখভারং প্রগাঢ়ং।
প্রিয়তম মম মন্যে সাধু নো মে হৃতং তৎ
কথমিতি হৃদভাবে দুঃখধর্ম্মোপপত্তিঃ॥

*গৌর বর্ণা শ্যাম বর্ণা স্ত্রীলোক (অপরার্থ)

(৪)

অনাবিল প্রেমভাষে প্রিয়তম! অনায়াসে
হরণ করেছ তুমি মোর প্রাণ মন,
অথচ আমার মন বল তবে কি কারণ
বিপুল দুঃখের ভার বহে অনুক্ষণ?
মনে হয়, এযে চুরি— নাহি কোন বাহাদুরী,
তুমি যদি মন মোর হরিতে পারিবে—
মনের ধরম দুঃখ কি হেতু জাগিবে?

(৫)

পারাবারো জনয়তু সুধাং কল্পনঃ ক্ষীরনামা
পানে তস্যা অমর পদতা কল্পনাশ্চর্য্যজন্মা।
যোহমুক্তৈর্ব্বে জলময়তনুং কুম্ভজেন প্রপীতঃ
সোহয়ং ধ্বংসী বিতরতি কথং জীবনং দেবলভ্যং?

(৫)

ক্ষীরোদ সাগরে সুধার জনম
এ কল্পনা নহে আশ্চর্য্য তেমন,
কিন্তু সে সুধায়— "অমরত্ব" পায়—
আশ্চর্য্য এ কথা এ চরাচরে।
অগস্ত্য গণ্ডূষে ত্যজিল যে প্রাণ,
সম্ভবে কি তার অমরত্ব দান?
নিজ প্রাণ নিজে— রাখিতে নারে যে'—
সে কেমনে সুধা দিবে অপরে?

অবকাশ।

(৬)

অন্তর্গূঢ়ং প্রণয়বিষয়ং প্রাকৃতৈরপ্রবেশ্যং
জ্ঞাতুং সুষ্ঠু প্রভবতি সদা মন্মথপ্রীতিপাত্রং
জাতো যস্ত প্রণয়িনয়নাৎ প্রাবিশদ্ যশ্চ চিত্তে
সোঽয়ং নান্ধো বদতু হি বরং মানবা দৃষ্টিশূন্যাঃ ॥

(৬)

যে কাম প্রসাদে হেরে কামিগণ,
হৃদয়নিরুদ্ধ প্রেম বিবরণ,
আঁখিতে জনম, করিয়া গ্রহণ
পশে' যে স্বপ্ন মনের মাঝে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী সে কাম নিশ্চয়,
কেন তবে তার অন্ধ পরিচয়?
যারা জ্ঞানহীন, কামে মুগ্ধ লীন,
তাদের অন্ধ বলাই সাজে

(৭)

মাতঃ পদ্মে! বদ চপলতা কীদৃশী শিক্ষিতা য-
দ্ধ্রাসং বৃদ্ধিং সততময়সে ভ্রাতুরেবাসি তুল্যা।
চন্দ্রোভ্রাতা বিতরতি দয়াং সর্বভূতে সমানাং
দোষং শঙ্কে ত্বনিয়তমহো নানুকর্তুং গুণান্স।

(৭)

মা লক্ষ্মি! এ চপলতা শিখিলে কেমনে?
কোথায় শিখিলে, হ্রাস— বৃদ্ধি, অনিয়ত বাস?
শশাঙ্কের ভগ্নী বটে বুঝিতেছি মনে!

সর্ব্বভূতে সম দয়া ভ্রাতা যে বিতরে
সে গুণ, তোমার চিতে— পায়নি কেন মা নিতে?
দোষানুকরণে সবে নিপুণতা ধরে॥

(৮)

দোষা দোষা বপ-রহিত-জনে খ্যায়তে সর্ব্বদেশে
ভিন্না এবাধিকর।গুণাস্বেতু রশ্মেঃ সমানাঃ।
সিন্ধোরুত্থৈরহিমুখবিষৈঃ পীড়িতা দেবদৈত্যা
ভুক্ত্বা শূলী তদপি মধুবন্নীলকণ্ঠো হি জাতঃ॥

(৮)

দোষ কভু হয় দোষ, গুণ বা কখন,
ভিন্ন রূপ হয় শুধু আধার কারণ,
বিভিন্ন আধার তরে রশ্মি নানা রূপ ধরে,
সিন্ধু-বক্ষ-আলোড়িত বাসুকিনিশ্বাসে
পলাইল দেব দৈত্য সভয়ে স্বৱাসে।
মধু সম পান করি, সে বিষ কণ্ঠেতে ধরি'
শূলপাণি—মহেশ্বর এ ধরণী ধামে—
হয়েছেন খ্যাত—আহা "নীলকণ্ঠ" নামে।

(৯)

কুসুমসদৃশমঙ্গং মার্দ্দবং তত্র হেতু
স্তদপি ন সদৃশৌ তৌ পুষ্পনার্য্যো কদাপি
বিতরতি সুখমেকা কেবলং রাত্রিভোগ্যং।
রতিমথচ হি দত্তে কামিনী সর্ব্বরাত্রং।

(৯)

বঙ্গ রমণী সনে ফুলের তুলনা
স্নিগ্ধ উভয়ে হয় ফুলও ললনা
মিষ্টতা মৃদুতায় দুই অতুলনা
তথাপি উপম নাহিক হয়।
ফুটন্ত ফুল যদি করহ পীড়ন
সুগন্ধ, নিশিতে সে করে বিতরণ,
প্রত্যূষে হেরি তারে ফিরাবে নয়ন ;
প্রতি রাতে নারী সমানই রয় ॥

(১০)

বুদ্ধোঽনিন্দৎ-স্বজনকবচো বন্ধুণো জন্ম লব্ধা
বেদী তস্মাভবদপি সবা শঙ্করঃ শম্ভুজন্মা।
বিষ্ণু র্গৌরঃ শ্রুতিমুপগতেঽদ্বৈতবাক্যে মনোজ্ঞে
জজ্ঞে পাপং নিজমতরতাঃ কিন্তু নিন্দন্তি ভিন্নান্ ॥

(১০)

মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব, শ্রুতির লিখন,
সবলে খণ্ডিত করি. তবু নারায়ণ।
শঙ্কর, শঙ্কর জাত সকল ভুবন খ্যাত—
কীর্ত্তি যার, বৌদ্ধমত করিয়া খণ্ডন।

আবার, মাধব আসি গৌরাঙ্গ জনমে
অদ্বৈত মধুর রব কি উদার মত নব,
শু'নলে জাগিত তাঁর পাপ ভয় মনে।
তবে সে কি নিন্দনীয় সাধারণ যত,
সুবিশ্বাসে ঠেলে যদি অন্য ধর্ম্মমত ?

(১১)

সবলমনুজগম্যা পৌরুষং স্যাৎ ক্ষমা যা
বিরহিতবলমাপ্য সাঽপি ঘৃণ্যা ক্ষমা স্যাৎ।
অবলমনুজনাশী বীরবাচ্যো নৃপঃ স্যা—
দিতর অথচ ঘৃণ্যাং দস্যুসংজ্ঞাং লভন্তে ॥

(১১)

সবল মানবে,—ক্ষমা,—পৌরুষ বিকাশ।
দুর্ব্বলেতে, সেই ক্ষমা—ভীরুতা প্রকাশ ॥
কাব্যে যবে মিথ্যা রহে, কল্পনা তাহারে কহে,
অন্যত্র, যেমন মিথ্যা তেমনই রয়।
রাজা—হত্যাকারী যবে বীর নাম দিয়া সবে
গাহে তাঁর জয়।
অন্যে যদি হত্যা করে, দস্যু নামে চরাচরে—
ঘৃণীত সে হয়।

তত্ত্বমসি

আরুণিতনয় শ্বেতকেতু বার বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করেন, তথায় বারবৎসর কাল বহু পরিশ্রমে অদম্য অধ্যবসায়ে বেদপাঠ সমাপন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাগত তনয়ের মুখে, বিদ্যার বিমল জ্যোতির সহিত, ব্রহ্মচর্য্যের স্বাভাবিক পবিত্রতায় আত্মাভিমান মাখান দেখিয়া, শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু! সমস্ত বেদপাঠ সমাপন করিয়া যে অবিনয়, যে গর্ব্ব, যে অভিমান মনে মনে পোষণ করিয়াছ, আপনাকে সমস্ত বেদ-বেদ তত্ত্বাভিজ্ঞ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছ, ইহা কি তোমার গুরুর উপদেশ? ইহা কি তোমার বেদ পাঠের ফল? এই শিক্ষার জন্যই কি তুমি এতদিন গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে? যে বস্তু কেবল শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশে লাভ করা যায়, তাহা কি গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? গুরুদেব এ বিষয়ে কি উপদেশ দিয়াছেন? যাহা শ্রবণ করিলে কোন বিষয় অশ্রুত থাকে না, যাহার আলোচনা করিলে কোন বিষয় অনালোচিত থাকে না, যে বস্তুর জ্ঞান হইলে কোন বস্তুই অজ্ঞাত থাকে না, যাহা না জানিলে কোন বিষয়ই প্রকৃতরূপে জানা যায় না, তাহা কি জানিয়াছ?"

শ্বেতকেতু পিতঃ! এক বস্তুর জ্ঞান হইলেই যে সকল বস্তুর জ্ঞান হয় এ কথা ত শুনি নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

আরুণি। যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘট, শরাব, কলসী প্রভৃতি সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়; এক মৃত্তিকাই নাম-ভেদে, রূপ ভেদে, অবস্থা ভেদে, নানা আকার ধারণ করে; কিন্তু সে ঘট, কলসী মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকারই স্বতন্ত্র বিকাশ, মৃত্তিকারই রূপান্তর জানিও। সে ঘট বা কলসী কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন? তাহা কি মৃত্তিকা নহে? যেমন এক মাত্র সলিল জ্ঞান হইলে ফেণ, বুদ্বুদাদি সলিলের বিকার সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়, সে ফেণাদি কি সলিল হইতে পৃথক্; তাহা কি সলিল নহে?

শ্বেত। পিতঃ! এ কথা ত গুরুদেবের কাছে শুনি নাই, বোধ হয় তিনি এ কথা জানিতেন না; আমি তাঁহার অনুগত, সেবাপরায়ণ, ভক্ত শিষ্য ছিলাম, আমাকে এ উপদেশ না দিবার ত কোন কারণ দেখি না। যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলেই সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, সে উপদেশ আমাকে প্রদান করুন।

আরুণি। শুন বৎস! এই প্রকাশিত বিশ্ব যাঁহার পূর্ণতায় পূর্ণ, জগতের এ পূর্ণতা দেখিয়া যাঁহার পূর্ণতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, যে পূর্ণতা না থাকিলে সকল বস্তুই অপূর্ণ, তিনিই পরম বস্তু। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ

প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে যিনি এক অদ্বিতীয়, এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যাঁহার মাত্র সত্ত্বা ছিল, তিনিই এক মাত্র সৎ।

শ্বেত। এক অদ্বিতীয় ছিলেন! এখন কি তবে তিনি এক অদ্বিতীয় নহেন? এখন কি সৎ নহেন? তবে কি তিনি অসৎ?

আরুণি। তাহা নহে। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তিনি যে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন— এখনও, জগৎ উৎপত্তির পরেও, তিনি সেই এক অদ্বিতীয় সৎই আছেন। তবে একটু পার্থক্য আছে, এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাঁহার সত্তা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার এ বিশ্ব-কাব্য প্রকাশ না থাকাতে তিনি অব্যক্ত অচিন্ত্য, শুধু চৈতন্যময় ছিলেন, এখন তিনি এক হইয়া নাম, রূপ, ক্রিয়াভেদে, অনন্ত কোটী কোটী রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, এক মাত্র কারণ হইতে অসংখ্য কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। একটী মাত্র বটবীজ বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষ রূপে আপনাকে প্রকাশ করে, এক মাত্র অগ্নির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্বেত। এক হইয়া বহু হইয়াছেন, তবে কি তাঁহার অবয়ব আছে, আকার আছে, যে কোটী কোটী হইবেন? অগ্নির আকার আছে, তাই স্ফুলিঙ্গ সম্ভব হয়, বটবীজের অবয়ব আছে তাই বটবৃক্ষ জন্মে, অংশ বা ভাগ না

করিলে এক কি বহু হইতে পারে? আকার বা অবয়ব না থাকিলে কি ভাগ হইতে পারে? যদি অবয়ব বা আকার থাকিল, তবে তিনি এক মাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় হয়েন কিরূপে? এ সন্দেহ মিটাইয়া দিউন।

আরণি। এক হইয়া বহু হইয়াছেন, এ কথাটি দুই প্রকারে হইতে পারে—একটি বিকার, অন্যটা বিবর্ত্ত। যাহা নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় তাহা বিকার। যেমন দুগ্ধ, হইতে দধি, নবনীত ও ঘৃত জন্মে, এস্থলে দুগ্ধ বিকৃত হইয়াই ক্ষীর এবং দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এ ভাবে বহু হওয়া বুঝিলে অনেক দোষ হইয়া পড়ে, আপত্তিরও সম্ভব হয়। আর যাহা নিজের স্বরূপ ত্যাগ না করিয়া আপনাকে অন্য রূপে প্রকাশ করে তাহা বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তিকায় রজত ভ্রম হইয়া থাকে, যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তিকা ও রজ্জু নিজস্বরূপে (রজ্জু ও শুক্তিকা) থাকিয়াই, রজত ও সর্প বিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন করিয়া দেয়, ইহা অজ্ঞানের ক্রীড়া, অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিবশে এ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। যখন রজ্জু ও শুক্তিকাকে—রজ্জু ও শুক্তিকা বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন রজ্জু ও সর্প বিষয়ক ভ্রম আপনিই কাটিয়া যাইবে, ইহাই বিবর্ত্ত। যখন স্বপ্নে অভিভূত থাক, তখন কি স্বপ্ন বলিয়া জানিতে পার? যখন সে স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, তখন বুঝিতে

পারিবে তাহা স্বপ্ন। যখন দিক্ ভ্রমে পড়, পূর্ব্ব দিক্‌কে পশ্চিম দিক্ ভাবিয়া থাক, তখন ইহা পূর্ব্বদিক্ বুঝাইয়া দিলেও, মন প্রাণ ঐক্য করিয়া বুঝিতে পার না, যে যাহা ঠিক জানিতেছ তাহা ভ্রম। যাহা জানিলে সকল জানা হয়, সে যেন একটি বোধ মাত্র, সমস্তই মায়া প্রপঞ্চ—

"স্বপনের মত পড়িয়া জগত
রয়েছে অনাদি অনন্ত কাল।

তিনি ভিন্ন যাহা কিছু আছে, সে সকলের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই; সে সকলই স্বপ্নমত ভ্রম, সকলই কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কারের পরিণাম, ইহা বুঝিলেই সকল বুঝা হইল জানিবে।

শ্বেত। বুঝিলাম তিনি এক অদ্বিতীয়ই আছেন, বুঝিলাম তিনি বিকৃত হয়েন না; পূর্ব্বমত বিশুদ্ধই থাকেন। কিন্তু দুর্গন্ধ সংসর্গে স্বতঃ পবিত্র গন্ধবহও দুর্গন্ধ হয়েন, তবে তিনি কিরূপে নিত্য বিশুদ্ধ থাকেন, এ কথা বুঝাইয়া দিউন।

আরুণি। বায়ুর যে আকার আছে, সে জন্য দুর্গন্ধ বস্তুর সূক্ষ্ম কণিকা বহন করিয়া দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, এ দৃষ্টান্তটি ঠিক নহে। দেখ আকাশ—ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, পটের মধ্যে পটাকাশ, গৃহের মধ্যে গৃহাকাশ ইত্যাদি নানারূপ নাম ধারণ করে। ঘট, পট, গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেল, আকাশের সহিত ঘট পটের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া

দাও. তাহাতে আকাশের কি? আরও দেখ, এক সূর্য্য সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শত সূর্য্য রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। সলিল চঞ্চল হইলে সলিল-বিম্বিত সূর্য্য চঞ্চল হয়, তাহা বলিয়া কি সূর্য্য চঞ্চল হইল বলিবে, না, সলিলের মালিন্য সে সূর্য্যে স্পর্শ করিল বলিবে? তবে তিনি নিত্যশুদ্ধ, অবিকৃত, অপরিণামী না হইবেন কেন?

শ্বেত। যখন তিনি দেহে থাকিয়া ফলভোগ করেন, সুখ দুঃখের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন, সংসর্গ বশে যে তাঁহার কোন ইতরবিশেষ হয় না, ইহা কিরূপে বুঝিব?

আরুণি। ফলভোগইবল, সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরক প্রাপ্তিই বল, ইহা অধ্যাস (আরোপ) ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়ার কার্য্য, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার বিকাশ, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র।

শ্বেত। অধ্যাস কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিউন।

আরুণি। অগ্নির দাহিকা শক্তি লৌহে আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি "লৌহোদহতি", লৌহ তাপ দিতেছে, আবার লৌহের গুরুত্ব গুণ অগ্নিতে আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি "অগ্নিপিণ্ডগুরুত্ববান্", অগ্নিপিণ্ড কি ভারি! সেই রূপ মায়ার কার্য্য, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া আরোপ করি। সেই আরোপের জন্য, সেই মিথ্যা ভ্রমবশে, আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি। প্রকৃত-

পক্ষে তিনি নির্ব্বিকার, নির্লেপ, সুখদুঃখবিমুক্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।

শ্বেত। যদি নির্লেপ, তবে দেহত্যাগের পর তিনি আবার দেহ ধারণ করেন কেন? সংস্কার বা পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য জনিত বাসনা লইয়াই ত দেহ আশ্রয় করেন, তবে তাঁহাতে বাসনা ও সংস্কারের মালিন্য স্পর্শ করিল না কই?

আরুণি। তুমি অন্ধকারে বৃক্ষশাখা নড়িতে দেখিয়া ভাবিলে প্রেতাত্মা, ভয় জন্মিল; আবার দেখিলে, দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া তোমাকে ধরিতে আসিয়াছে, প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিলে; দেখ, ভয় পাইলে বলিয়াই ত পলায়ন কার্য্য হইল, বৃক্ষশাখায় প্রেতভ্রম হইল বলিয়াই ত ভয় পাইলে; যদি বুঝ যে উহা বৃক্ষশাখা, তবে ভয় চলিয়া যাইবে, পলায়ন কার্য্যেরও নিবৃত্তি হইবে। আছে—বলিয়াই কার্য, নাই ভাবিলে কার্য্য হইত না। জন্মকার্য্য সেইরূপ, সংস্কার থাকে মনে করি বলিয়াই থাকে, থাকে না বুঝিতে পারিলে কিছুই থাকে না, শূন্যের গাঁট, আকাশ-কুসুম, মরুভূমে মরীচিকা।

শ্বেত। যাহা কিছুই নহে, যাহা আরোপ মাত্র, তাহা আছে ভাবা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কেন? যাহা নাই তাহার দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয় কেন?

আরুণি। মায়ার খেলা—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী. আবরণ বিক্ষেপ-শক্তিমতী মায়ার খেলা।

শ্বেত। আপনি বুঝাইলেন তবু আমি বুঝিতেছি না কেন?

আরুণি। ইহাই মায়ার খেলা। মায়ায় আবদ্ধ থাকে বলিয়া বুঝা যায় না; সেই আরোপিত মিথ্যা সংস্কারের জন্য আপনাকে বদ্ধ ভাবা যায়, আর এই প্রকার ভাবাও মায়া-বদ্ধ জীবের স্বভাব; মায়ামুগ্ধ মলিন অন্তঃকরণে সে জ্ঞান জন্মে না, সমল সলিলে কখনও প্রতিবিম্ব পড়ে না। যেখানে মায়া অথবা অজ্ঞানলেশ মাত্র আছে সেখানে এ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অন্ধকার থাকিতে আলোক হয় না।

শ্বেত সে মায়া কি?

আরুণি। তাহা সিসৃক্ষা—সৃজন করিবার ইচ্ছা মাত্র। যখন নিত্যবুদ্ধ, নিত্যজ্ঞান, চৈতন্যময় পরম ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—সেই ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত হইল; তখন তিনি এক হইয়াও মায়াবশে বহু হইলেন। মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, একই কথা।

শ্বেত। তবে ত ইচ্ছা বা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া সদ্বিতীয় হইলেন?

আরুণি। প্রকৃত সদ্বিতীয় হয়েন না, তুমি কি তোমার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া সদ্বিতীয় হও? মায়া যখন তাঁহার ইচ্ছা মাত্র, সেই ইচ্ছা কি তাঁহা হইতে ভিন্ন? নদী যেমন খাল, বিল, উপনদী সকলকে—আপনার কুক্ষির ভিতর লইয়া, অবশেষে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া আপনার সত্ত্বা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে; মায়াও তদ্রূপ

সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনাতে মিশাইয়া অবশেষে সেই পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া আপনার সত্তাটুকুও লোপ করিয়া ফেলে। সেই পরম-ব্রহ্ম বস্তু কে জান? তাহা তুমি! তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

পরমাণু

এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি? বাস্তবিক জগৎ বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? আকাশ, পবন, তেজ, সলিল ও পৃথিবী বা ইহাদের বিকার ছাড়িয়া দিলে জগতের পৃথক্ সত্তার উপলব্ধিই করিতে পারি না; ঐ সকলের সমষ্টিরূপের নাম দিয়াছি জগৎ। গম ধাতু কিপ্ করিয়া জগৎ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; জগৎ অর্থে গতিশীল বুঝায়। নিয়ত গতিশীল বলিয়া ঐ সকলের নাম জগৎ! ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধ্বজ্বলন্ প্রভৃতি গমনের ভিতর পাওয়া যায়। বিভিন্নতাপ্রাপ্তই বল, পরিবর্ত্তনশীলতাই বল কিম্বা বিকারই বল, সকলই গমনের ভিতর; কিন্তু সাধারণত গমন বলিতে আমরা এ গুলি বুঝি না।

যদি সত্যযুগের কোন মানব বর্ত্তমান সময়ে এই জগতে আগমন করেন, তিনি সেই অতীত জগতের সহিত বর্ত্তমান জগতের কত বিভিন্নতা দেখিতে পান। যেখানে সাগর ছিল, সেখানে মহা অরণ্য হইয়াছে. যেখানে বহুজনসমাকুলা বিচিত্র নগরী ছিল, সেখানে ভীষণ স্রোতঃস্বতী বিশাল জলরাশি বক্ষে ধরিয়া বহমানা; অতীতে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই, যাহা ছিল না তাহা হইয়াছে। সত্যযুগের কোনও মানবের সহিত বর্ত্তমানে মানবের কত বিভিন্নতা! সামান্য বিশ বৎসরে যখন "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাং" দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে লক্ষ লক্ষ বৎসরান্তে "পুরা যত্র স্রোতো নগরমধুনা তত্র মধুরং," সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

তবে কি সত্য সত্যই জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে! সূক্ষ্মভাবে বুঝিলে—অন্তর্দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই; অবয়বের পরিবর্ত্তন মাত্র ঘটিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন "অমরুক" দেহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার অবয়ব না থাকিলেও কি তিনি শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন আর কেহ হইয়াছিলেন? আমি দেহ হইতে দেহান্তরে যাইয়া থাকি; ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা কি সত্য বলিয়া বোধ হয় না যে ভিন্ন দেহস্থিত আমার সহিত এ আমার কোনও বিভিন্নতা নাই? আস্তিক আত্মার অবিনাশী ভাব মানিয়া থাকেন।

জগৎপ্রাণ সমীরণ সেই ভাবে বহিতেছে, তপন সেইরূপই আলোক দিতেছে. চন্দ্র ও তারকা সেই মত আকাশে ছুটিতেছে,

মনুষ্য ও জীবজন্তু বাসনাবশে সেই মত ছুটিতেছে, তরঙ্গিণী কুল কুল শব্দে সেই ভাবে সাগরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিতেছে, সাগরও তেমনি গভীর, বেলাভূমি অতিক্রম করিতেছে না, ঋতু পূর্ব্বমতই পর্য্যায়ক্রমে যাইতেছে ও আসিতেছে, তবে জগতের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে? আমাদেরও বাল্যের সহিত যৌবনের, যৌবনের সহিত জরার কত প্রভেদ! প্রকৃত জগৎ একরূপ, অপরিবর্ত্তনীয়, অনাদিকাল প্রবৃত্ত ও নিত্য।

এখানে একটি আপত্তি হইতে পারে! অবয়ব যখন অনিত্য, আর অবয়ব ছাড়িয়া অবয়বীকে যখন পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না, তখন অবয়বীও অনিত্য। "অবয়ব নাশে অবয়বীর নাশ" এ প্রমাণ আমরা অস্বীকার করি না; অবয়ব ছাড়িয়া অবয়বীকে পৃথক্‌ভাবে না বুঝিতে পারিলেও অবয়ব হইতে যে একটি অবয়বী পৃথক্ ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটি ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে মৃত্তিকা পোড়াইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আর যদি ধূলিমুষ্টি ঘট-আকারে সাজাও তবে এই ঘটের দ্বারা প্রকৃত ঘটের কাজ হয় না; একটির অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ঘটের কোন ক্ষতি হয় না, অপরটির সামান্য অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই সমস্ত ঘটটি ভাঙ্গিয়া যায়; আবার দেখ, কতকগুলি সূত্র দ্বারা একখানি পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা হইল। যদি অনিয়মিত ভাবে শুধু সূত্রগুলি একস্থানে কর, তাহার দ্বারা বস্ত্রের কাজ হইবে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, একটির অবয়বসমষ্টি হইতে অবয়বী

উৎপন্ন হইয়াছিল, অপরটির তাহা হয় নাই, তাহা কেবল অবয়বের সমষ্টি মাত্র ছিল।

অবয়বী নিত্য, আর অবয়ব অনিত্য, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন জগতের অবয়ব দেখি, তখন জগৎ অনিত্য, আর যখন জগতের অবয়ব বিকাশ দেখি না, তখন জগৎ নিত্য ; এ কথাটি পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে হইবে। অবয়ব বিকাশের পূর্ব্বে জগতের যে সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহার অবয়ব নাই বলিয়া নিত্য। কেন তাহাতে অবয়ব সূক্ষ্মরূপে থাকিতে পারেনা তাহা বিচার্য্য। পট দ্রব্য, দ্রব্য মাত্রেরই গুণ থাকে, যেমন পটের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার গুণ স্বীকার করি না, সেইরূপ জগতের সূক্ষ্ম অবস্থারও অবয়ব স্বীকার করিতে পারি না।

একটি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহাতে ইষ্টক, চূর্ণক ইত্যাদির যথাযথ সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না ; সেই মৃত্তিকা রেণু আকারে উড়াইয়া দাও, দেখিবে স্থূল মৃত্তিকা কিছুই নহে ; ক্রমশঃ সেই রেণু সূক্ষ্মতম হইলে যখন আর দেখা গেল না, তখন স্থূল রেণু কিছুই নহে ; এইরূপে যত সূক্ষ্মে যাও না কেন, শেষ একটি চরম অবস্থা মানিয়া লইতেই হইবে, যেহেতু তুমি তাহার কিছুই লয় করিতে পারিবে না। এক সংখ্যাটিকে কোটী কোটী ভাগে বিভক্ত কর না কেন, তাহা কখন শূন্যে পরিণত করিতে পারিবে না। এইরূপে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম করিতে করিতে শেষ এমন একটি অবস্থায় দাঁড়াইবে, যাহা অবিভাজ্য চরম অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, নতুবা অনবস্থা দোষ ঘটে।

যথন শেষ কণিকা লোপ করিতে পারিবে না. তথন যন্ত্রের অতীতই হউক বা যাহাই হউক, তাহার শেষ অবিভাজ্য চরম অবস্থা মানিতে হইবে। প্রত্যক্ষের অগোচর, এজন্য নিরবয়ব, (অবয়ব থাকিলে কখনও না কখনও প্রত্যক্ষ গোচর হইত সন্দেহ নাই)। যে দ্রব্যের অবয়ব আছে. সেই দ্রব্যই প্রত্যক্ষগোচর ও নষ্ট হইয়া থাকে। দ্রব্য যথন ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের ভিতর আইসে, তথন অবয়বের অস্তিত্ব ও নশ্বরতা মানিতে হইবে।

সেই নিরবয়ব সূক্ষ্ম দ্রব্যের পরস্পর সহযোগে যে একটি অবয়বীর সৃষ্টি হইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? নিরবয়বের পরস্পর সংযোগ ঘটিতে পারে না—ইহা বলিতে পার না! কারণ ঘট পটাদি দ্রব্যের সহিত নিরবয়ব আকাশের সর্ব্বদা সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষের প্রকৃত অগোচর তাহার সমষ্টি কিরূপে প্রত্যক্ষের গোচর হইবে? এখানে প্রত্যক্ষের অগোচর এ কথার অর্থ এই যে, যাহাকে পরমাণু বলিয়া থাকি, সেই অবিভাজ্য চরম অবস্থার, মহত্ত্ব বা প্রত্যক্ষ যোগ্যতা নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ ঘটে না, যদি মহত্ত্ব থাকিত তবে প্রত্যক্ষ হইত সন্দেহ নাই। এখানে আপত্তি হইতে পারে, যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহার সমষ্টির মহত্ত্ব কোথা হইতে আসিবে? মহত্ত্ব কাহাকে বলে. "যৎ খলু রূপসহায়ং সাশ্রয়ং প্রত্যক্ষয়তি তন্মহৎ পারিমাণং" তাহার ধর্ম্ম মহত্ত্ব। পরমাণু অণু, তাহার ধর্ম্ম অণুত্ব, স্থূলের যে ধর্ম্ম তাহা মহত্ত্ব নাম ধারণ করে।

একটি পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকিলেও পরমাণুপুঞ্জের মহত্ত্ব হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় নাই।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব একটি কারণ দাঁড়াইল। কিন্তু মহত্ত্ব থাকিলেও ঘন অন্ধকারে কোন বস্তু দেখিতে পাই না বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব যে কারণ নহে ইহা হইতে পারে না। মহত্ত্ব সাধারণ কারণ হইলেও, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি, মহত্ত্ব যেরূপ কারণ; চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত—আলোক ও চক্ষুর নির্ব্বাধ সংযোগও সেইরূপ কারণ হইয়া থাকে।

একগাছি কেশ দূর হইতে দেখা যায় না, দূর হইতে দেখিতে হইলে যেরূপ মহত্ত্ব থাকা আবশ্যক, একগাছি কেশের সে মহত্ত্ব নাই; কেশগুচ্ছ দেখা যায়, কারণ তাহার মহত্ত্ব আছে। পরমাণুরও মহত্ত্ব নাই বলিয়া দেখা যায় না, যদি থাকিত দেখিতে পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই।

*ছয়টি পরমাণু সংযোগে এক ত্রাসরেণু হয় তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে; এইরূপে পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযোগে সমষ্টিরূপে ক্রমশঃ এমত একটি অবস্থায় পরিণত হইল, এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ এমত একটি অবয়বী সৃষ্টি হইল, যাহাকে আমরা জগৎ নামে অভিহিত করিয়া থাকি; এই জগৎ বিশ্লেষণ করিলে পরমাণু ভিন্ন আর কোন উপাদান পাওয়া যায় না।

*ইহা বৈশেষিক ও ন্যায় মত সিদ্ধ

অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ চারিদিকে বাত্যাবিতাড়িত ধূলি-কণার মত, হৈমন্তিক প্রভাতের বাষ্পদলের তুল্য ছড়াইয়া আছে, তবে যে অনিয়মিত সংযোগে একটা বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয় না, একটা অস্বাভাবিকতার উৎপত্তি হয় না, তাহার কারণ নিয়ন্ত্রী-ঐশীশক্তি। প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক পরমাণু হইতে ভিন্ন, অথচ ইহা সচরাচর জগৎরূপে পরিণত হইয়াও সেই বিভিন্নই থাকে। দেখ, কড়ির ঘর কেমন পর পর সাজান রহিয়াছে; প্রতি কড়ি প্রতি কড়ির সহিত বিভিন্ন থাকিয়া কেমন একটি খেলনারূপে আপনারা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আপনা আপনি মিশিলে এইরূপ ধারাবাহিক ও নিয়মিত মিলন ঘটিত না; যদি নিয়ন্ত্রী শক্তি না থাকিত, তবে পরমাণুপুঞ্জ মাথার উপর পাহাড় সৃষ্টি করিত, গৃহের ভিতর স্রোত বহাইত, এবং এই জগৎ এমন অবস্থায় পরিণত হইত যে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। তবে দাঁড়াইল, সূক্ষ্ম জগৎ (পরমাণুপুঞ্জ) প্রত্যক্ষের অগোচর, নিরবয়ব, অপরিবর্ত্তনশীল, অনাদি অনন্ত কাল-প্রবৃত্ত ও নিত্য। স্থূল-জগৎ প্রত্যক্ষগোচর, অবয়ব সম্পন্ন, পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য।

সুখ।

এক দিন পূর্ণিমা নিশায় কৃষ্ণসলিলা-যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছিলেন। গোপিকারা কেহ কৃষ্ণের বাহুবল্লী আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহ বা একদৃষ্টে কৃষ্ণের মুখপানে তাকাইয়া আছেন ; সকলের চক্ষু জলভরা, সকলের শ্রবণ বংশীরবে মাতোয়ারা, সকলেই ভাবে বিভোর, প্রেমে গদগদ, সকলেরই বসন আলুথালু, কবরী এলুলায়িত ; কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই, গৃহের কথা মনে নাই। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন "বাঁশী আজ আর বাজিবে না, আমি চলিলাম" গোপিকারা বিরহভয়ে কাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। "হে গোপীজন বল্লভ ! আমাদের এ সুখে বঞ্চিত করিও না, আমরা এই জোৎস্না পুলকিত রজনীতে প্রাণভরা ভালবাসা তোমার চরণে দিব বলিয়া আসিয়াছি, লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি দিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি! তুমি চলিয়া যাইও না, আমাদের এ ভালবাসা অবজ্ঞা করিও না"।

কৃষ্ণ। তোমরা আজিও প্রকৃত ভাল বাসিতে শিখ নাই

গোপী। প্রকৃত ভালবাসা তবে কি স্বামিন্ !

কৃষ্ণ। আমাকে ভাল বাস, আমি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কিছু ভাল বাসিবার নাই বলিয়া ভালবাস, আমিই সমস্ত, সমস্তই আমি, আমি ময় ত্রিজগৎ, ইহা জানিয়া আমাকে

ভাল বাস। মন প্রাণ, আশা ভরসা, কাম তৃষ্ণা, সকলই আমাতে মিশাইয়া দাও! আমি পুরুষ, তোমরা স্ত্রীলোক; আমি কিশোর, তোমরা কিশোরী; ইহা একেবারে ভুলিয়া যাও; তোমরা কুলের কুলবধূ, গৃহের গৃহ লক্ষ্মী, স্বামীর ভালবাসার পাত্রী, এ স্মৃতি একেবারে— হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, তাহাই ভালবাসা তাহাই প্রকৃত সুখ।

গোপী। আমরা তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই ত জানি না। মান অপমান, সুখ দুঃখ, লজ্জা মোহ, সবই ত তোমাতে দিয়াছি; হৃদয় পটে তোমার মূর্ত্তি আঁকা আছে, মানস-তন্ত্রীতে কেবল তোমার নামে অজানা স্বর বাজিয়া উঠে, তবু তোমার অভাব বোধ করি কেন? তবু দুঃখ পাই কেন?

কৃষ্ণ। সেরূপ যদি ভাল বাসিতে পারিতে, তবে "গৃহ ছাড়িয়া এই রাত্রে তোমার নিকট আসিয়াছি" এ অভিমান কেন? আমার বংশীরব শুনিয়া, অথবা আমার অন্য কোন কিছু দেখিয়া তোমরা ভাল বাসিয়াছ! এ ত ভালবাসার প্রথম অবস্থা; ভাল বাসিয়াছ তবে আবার ভেদ জ্ঞান কেন? আবার মান অভিমানই বা কেন? আমার সংসর্গ অভিলাষই বা কেন? আমি তোমাদের নিকট থাকি বা নাই থাকি, তাহাতে তোমাদের সুখ দুঃখ কি? আমার এ দেহ এখানে থাক্ বা না থাক্

তাহাতে তোমাদের ভালবাসার যায় আসে কি? সাধারণ সুখ বাহিরের জিনিষের অপেক্ষা করে, বাহিরের জিনিষের অভাব হইলে এ সুখেরও অভাব হইয়া পড়ে। বিষয় থাক বা না থাক, বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভাবেও যে সুখ থাকে, সে সুখের কখনও অভাব হয় না। যে ভালবাসায় দৈহিক সুখ সচ্ছন্দতা থাকে, মানসিক তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা থাকে, মিলনের আকুলতা, বিরহের ভয় থাকে, মোহের অবসাদকরী শক্তি থাকে, সে ভালবাসায় প্রকৃত সুখ কখন লাভ হয় না; তাহা নদীর জলের মত জোয়ারে বাড়ে, ভাটায় কমে, নিদাঘে তপ্ত হয়, শীতে শীতল হয়। যে ভালবাসার তন্ময়তার ভিতর, জগতের সমস্ত কোলাহল বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতির স্বাভাবিক স্পন্দন অনুভব করা যায় না, তাহাই ভাল বাসা। এরূপ ভালবাসার খরতর প্রবাহে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন তৃণের মত ভাসিয়া যায়, এ ভালবাসা কিছুতেই বিচলিত হয় না; বিপদে সম্পদে সকল সময়ে স্থির থাকে, এইরূপ ভালবাসার অনুশীলন কর, প্রকৃত সুখ আপনি আসিবে! ভালবাসা সমুদ্রের মত অসীম ও গভীর! বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত কিছুতেই বিচলিত হইবে না, ইহাতেই চির সুখ ও চির শান্তি।

গোপী। আমরা তোমাকে চাহি। তোমাকে ত্যাগ করিয়া সুখ চাহি না। মুক্তি চাহি না, ভগবান্‌ও চাহি না, তুমি

হইতেও চাহি না, ক্ষীর খাইতে চাহি, হইতে চাহি না; আমরা কেবল তোমাকে জানি তোমাকে চাহি।

কৃষ্ণ। আবার! আবার ঐ ভেদ জ্ঞান! ভগবান্ চাহি না ও কি কথা? তবে ত আমাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিতেছ! ভাল বাসিতে চাও, মন প্রাণ ঐক্য করিয়া বল "তুমি স্বামী, তুমি প্রভু, তুমি ভগবান্, তুমি সকলই আমার, তোমাকে ভাল বাসি, তোমার জড় দেহের জন্য ভাল বাসি না, তোমার ঐ নবজলধর-শ্যামরূপের জন্য ভাল বাসি না, বুঝি তোমার জন্য ভাল বাসি না, কেবল তোমাকে ভাল বাসিবার জন্য ভাল বাসি, তোমা ভিন্ন আর কিছু জানি না, জানিতে চাহি না; তুমি ভগবান্ হও, মানুষ হও, কিছুই জানি না। আমরা জানিবার কে? ভাবিবার কে? তুমি বিনা আমরা কি? তুমি সাগর, আমরা তোমার বুদ্বুদ ফেণা।"

মনে ভাব "তোমাকে দেখিতে আসি না, তোমাকে দেখা দিতে আসি না, কেন যে আসি তাও বুঝি না।" এইরূপ ভাবে যদি ভাল বাসিতে পার, তবে প্রকৃত সুখ পাইবে। সে সুখে বিচ্ছেদ থাকিবে না, সে সুখে নিরাশা থাকিবে না, সে সুখ দুঃখের লেশশূন্য, সে সুখ

অগাধ অনন্ত, সে সুখ কেমন তাহা বলা যায় না, সে সুখ অপরিমেয়, অচিন্তনীয়, সে সুখের তুলনা নাই।

"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে"

পরমাত্মা।

—:০:—

পরমাত্মা মনের দ্বারা পাওয়া যায় না, "যন্মানসা ন মনুতে" আবার মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, "মনসৈবেদমাপ্তব্যঃ" যাহা মনের অগোচর, তাহা মনের গোচর হইতে পারে না, আর যাহা মনের গোচর, তাহা মনের অগোচর হইতে পারে না। যিনি উপাধিশূন্য, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার; যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, বিশেষণ নাই; বাক্য যেখানে পৌঁছে না, মনের গতি যেখানে যাইতে পারে না; যে স্থানে তপন আলো দেয় না, পবন বহে না, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, সেই জ্যোতির্ম্ময়, সচ্চিদানন্দময়কে মন কেমন করিয়া বুঝিবে? কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে।

যিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসংনিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ," যাঁহাকে জানিলে সংসারে আসিতে হয় না, বাসনা উন্মূলিত হয়,

অবিদ্যা থাকে না ; আনন্দ যাঁহার রূপ, সত্য যাঁহার আয়তন, মায়া যাঁহার শরীর, জগৎ যাঁহার প্রতিকৃতি, ষড়ঙ্গবেদরূপে যাঁহার প্রতিষ্ঠা, যিনি আদিত্য বর্ণ, তবে তিনি অরূপ হয়েন কিরূপে? রূপ কাহাকে বলে? যে রূপে তিনি রূপিত হন তাহাই তাঁহার রূপ, যেরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যায় তাহাই তাঁহার রূপ। ইহাই উপাধি। চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না, চৈতন্য পরমাত্মার রূপ। রূপ অর্থে স্বরূপ ; গুণ নহে, বিশেষণ নহে, বা বর্ণও নহে।

মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প ; মন সুখ দুঃখ অনুভব করিতে জানে, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে, আর জানে সংসারের দুর্ভেদ্য বন্ধনে কিরূপে আপনাকে বদ্ধ রাখিতে হয়। মনের গতি বাহ্য জগৎ, মনের রাজ্য বাহ্য বিষয়, মনের প্রসার দ্বৈত প্রপঞ্চে। যাহার চৈতন্যে জড় হইয়া, পঞ্চভূতের পরিণামস্বরূপ হইয়াও মন চেতন, যাঁহার মায়ায় মন গতিশীল, যাঁহার শক্তিবশে মন শক্তিমান্, তাঁহাকে মন কেমন করিয়া বুঝিবে? অগ্নি তাহার দাহ্য বিষয় দগ্ধ করিতে পারে, তাহা বলিয়া নিজের স্বরূপ দগ্ধ করিতে পারে না, বা প্রকাশ করিতেও পারে না।

মনের মনন ক্রিয়া মনের অধীন হইতে পারে না ; হইলে কি হইত জান? সংসারে মন্দ কাজ হইতে মানুষে বিরত হইত, ভাল কাজে প্রবর্ত্তিত হইত, জানিয়া শুনিয়া কেহই পাপপথে যাইতে চাহিত না, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাময় বহ্নিতে সকল প্রাণীকে পুড়িতে দেখিয়া, আবার সেই বহ্নিই শান্তির উপায় ভাবিয়া

পতঙ্গের মত তাহাতে কেহ ঝাঁপ দিত না। "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ" ধর্ম্ম জানি, তাহাতে প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্ম জানি, তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়; মন নিজের ইচ্ছায় চলে না, নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করে না।

যাঁহার ইচ্ছায় মন মন্ত্রচালিত ভুজঙ্গের মত চালিত হয়, তিনি পরমাত্মা। যাঁহার ইচ্ছায় আকাশ, পবন, তেজ, সলিল ও পৃথিবী প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি পরমাত্মা। যাঁহার মায়ায় মানুষ অনিত্য সংসারকে নিত্য বলিয়া ভাবে, জীবগণের নিয়ত মরণ দেখিয়াও নিজেদের মরণের কথা একবার মনে করে না; আমার গৃহ, আমার পত্নী, আমার দেহ, আমার সংসার, এ অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না বা ত্যাগ করিতে চাহেও না, তিনি পরমাত্মা। "নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্," যিনি অচেতনের চৈতন্য সম্পাদন করেন, যিনি ভূতে ভূতে থাকিয়াও তাহার বাহিরে থাকেন; যিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, যাঁহাকে বুঝাইতে হইলে "নেতি নেতি" বলিয়া বুঝাইতে হয়, তিনিই পরমাত্মা।

মন আমার, আমি মন নহি,
সেই আমি কে? পরমাত্মা।

মন অণুপরিমাণ, সে কেমন করিয়া "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ পরমাত্মার স্বরূপ

বুঝিবে ? কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে সম্যক্ ধারণা করিবে ? সমুদ্রের সমস্ত সলিল ধারণ করা সামান্য তড়াগের কার্য্য নহে। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয় মগ্নিঃ"

যারে কেন্দ্রীভূত করি গ্রহ সমুদয়।
দিগন্তে প্রকাশ পায় মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়
যাঁহার জ্যোতিতে সবে সমুজ্জ্বল রয়॥

সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপক হইয়াও মন অণু বলিয়া এক সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের উপর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না।

"যুগপজ্‌জ্ঞানানুপপত্তির্মনসো লিঙ্গং"

তবে যে এক এক সময় দুই তিন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য এক সময়ে দেখা যায়, তাহার কারণ মনের গতি অত্যন্ত দ্রুত। যেমন কোমল পত্রাবলী সূচিবিদ্ধ করিলে মনে হয় যে সমস্তগুলিই এক সময়েই বিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা এক এক করিয়াই বিদ্ধ হয় ; ইহা যেমন অনায়াসে বুঝা যায়, সেইরূপ এক গননা করিতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে মন সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করিতে পারে।

মন জ্ঞেয় বিষয়ই জানিতে পারে, পরমাত্মা অজ্ঞেয়, তাহা বিদিত অবিদিত হইতে ভিন্ন, "বিদিতাদধি অবিদিতাদধি" তাঁহাকে বুঝা সম্ভব নহে। পরমাত্মজ্ঞানের প্রতি মন করণ, কর্ত্তা নহে ; পরমাত্ম দর্শনের প্রতি মন চক্ষু মাত্র, মন একটি যন্ত্র বিশেষ।

আত্মা যদি রথী হয়েন, বুদ্ধি তবে সারথি, মন বল্গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, শব্দাদি বিষয় তাহার পথ। বল্গা যেমন অশ্বগণকে বিপথে যাইতে দেয় না, সুপথে লইয়া যায়; কিন্তু সেই বল্গা যেমন কাহারও চালনা ব্যতীত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না; উহা অনিপুণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে বরং বিপথে যাওয়ার সুবিধা করিয়া দেয়, সেইরূপ মন সংযত থাকিলে তবে দেহীকে সৎপথে লইয়া যায়, নচেৎ বিপথে ফেলিয়া দেয়। বৃক্ষ ছেদন করিতে হইলে, কুঠারাদির আবশ্যকতা হয়, আবার কুঠারাদি কখন আপনা আপনি বৃক্ষ ছেদন করিতে পারে না, ছেদকের অপেক্ষা করে; মনও তদ্রূপ আপনা আপনি চলে না, জড়যন্ত্র চালক ভিন্ন তাহার কার্য্যকরী শক্তির আবির্ভাব করিতে পারে না। তাই শিষ্য প্রশ্ন করিলেন "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" মন কাহার ইচ্ছায় কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে গমন করে?

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীধী ভী রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব"

নিষ্ক্রিয় আত্মা রথীর মত স্বয়ং ফলভোগ না করিলেও, অন্তঃকরণ উপাধি বশতঃ ফলভোগী হয়েন। অল্পদেশ বিস্তৃত মেঘ বহুদেশ বিস্তৃত-সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের নয়নপথ আবরিত করাতে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; আত্মাও সেইরূপ মালিন্য স্পৃষ্ট না হইয়া, মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া, সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও, পদ্মপত্রস্থিত জলের মত নির্লেপ থাকিয়াও, বদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, অন্তঃকরণ ধর্ম্ম, মালিন্য কলুষিত বলিয়া, সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, ও বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আত্মাও আচ্ছন্নবদ্ধ, ফলাফল ভোগ কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত তিনি নির্ব্বিকার, নির্লেপ ও স্বতঃ পবিত্র ও স্বয়ম্প্রকাশ।

"নৈব বাচা ন মনসা", "মনসৈবেদমাপ্তব্যঃ" ইত্যাদিস্থলে মন করণ; "মনসিউপলভ্যতে" ইত্যাদি স্থলে মন অধিকরণ; করণ বা অধিকরণ কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যেমন নির্ম্মল সলিলে ছায়া পড়ে, স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ নির্ম্মল মনে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন, কলুষশূন্য বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই আত্মজ্যোতি প্রতিফলিত হয়েন, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রদ্বারা সংস্কৃত বিশুদ্ধচিত্তই আত্মজ্ঞানের সহায়, শান্ত, দান্ত, মুমুক্ষু, শ্রদ্ধাবান্, বিশুদ্ধমনা মানবই এই আত্মবিদ্যার অধিকারী। মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, চিত্ত মনেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র, স্বরূপতঃ কিছুই ভেদ নাই। যে অবিদ্যা বশে আমরা বদ্ধ, সেই অবিদ্যা নাশ মনের কার্য্য; যে প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আমরা আত্মদর্শন করিতে পারি না, সে প্রতিবন্ধকতা নাশ মনের কার্য্য; যে বাসনা, যে সংস্কার সংসারের কারণ, সে সমস্ত বিদূরিত করা মনের অধীন; যে অবিদ্যাবশে আমরা মরুভূমে মরীচিকা দেখি, আকাশে গন্ধর্ব্বনগর দেখি, স্বপ্নময় আবরণের ভিতর জাগ্রতবাসনার মনোহর ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হই, সে সমস্ত ভ্রম নিরাস করা মনেরই সাধ্যায়ত্ত।

মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর, আত্মজ্যোতিঃ আপনিই প্রতিফলিত হইবে, সলিল স্বচ্ছ কর—ছায়া আপনিই পড়িবে, পড়িতেই হইবে এ অভিমান পোষণ করিও না। এই অভিমানই মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট অন্তরায়। এইরূপে মনের দ্বারা পাওয়া যায় ইহা সম্ভব হয়। তুমি মন শুদ্ধ কর, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ শোক, মায়া মোহ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখ, ভগবানের উপর সকল বিষয়েই নির্ভর করিয়া থাক, তন্ময় হইয়া আকুলপ্রাণে ডাকিতে অভ্যাস কর, তিনি দয়া করিয়া আপনিই তোমায় বুঝাইয়া দিবেন, তুমি কে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাং"।

"সদানন্দরূপঃ শিবোঽহং" ভাবিতে থাক, আপনি যে সেই তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না এই জন্য গীতাকার বলেন "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" জ্ঞানী আমার আত্মাই জানিও। ঐ শুন ভগবান্ বলিতেছেন :—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমার তৃপ্ত্যর্থে পূজা কর, আমাকে করযোড়ে নমস্কার কর, আমাকে পাইবার ইচ্ছা কর, আমাকেই পাইবে;—আমিই উদ্ধার করিব।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্মফল ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ কর, আপনার অস্তিত্ব তাঁহাতে মিশাইয়া দাও, আপনার কর্ত্ত্বাভিমান একেবারে

বিসর্জ্জন দাও, সকল জীবে একই চৈতন্য, সকলের হৃদয়ে এক নারায়ণ আছেন ইহা অনুভব কর, ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে, তখন ভগবানই বুঝাইয়া দিবেন যে, তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহ, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" তখন বুঝিবে তুমি তাঁহারই বিকাশ মাত্র, সেই সমুদ্রোপম ভগবানের একটি বুদ্বুদ স্বরূপ হইয়াও বুঝিবে, যে, সে বুদ্বুদ্ সমুদ্র জলেরই রূপান্তর মাত্র। ভগবানের এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ওঁ তৎ সৎ।

প্রতিমাপূজা।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রতিমাপূজা আর্য্যগৃহে চলিয়া আসিতেছে। প্রতিমা পূজায় ভারতবাসীর অবসাদক্লিষ্ট, জড়তা-নিস্পন্দ হৃদয় অভিনব স্পন্দনে স্পন্দিত হয়, সারাজীবনের নির্জ্জীবতা, সজীবতার মৃদু মোহকর স্পর্শে সজীব হইয়া উঠে; বালকের হাস্যে মৌনমুগ্ধ গৃহ, বিহঙ্গের কাকলী রবে চারু বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠে। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যখন আমাদের মানস অস্ত্রে কলঙ্ক পড়িয়া যায়, তখন কোন্ শাণযন্ত্রে তাহা সুশাণিত হয়? কোন্ মন্ত্রে সুপ্তপ্রাণ আপনার স্বভাবপরিচিত অলসতার আবেশময় অলীক মোহস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া থাকে? কাহার বাজনার স্বরে শিশুবৃন্দ নববেশে সজ্জিত, যুবকদল নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত, বৃদ্ধগণ উৎসাহান্বিত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হয়? কোন্ সময়ে কিশোরীরা প্রীতিমুগ্ধ লজ্জানম্র হৃদয়ে কোন্ অজানা সুখের আশায় পথপানে অনিমিষনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? তাহা জগজ্জননী চিচ্ছক্তি মহামায়ার আগমনে, তাহা কি,—না প্রতিমাপূজা।

এই প্রতিমাপূজার অসাধারণ গুণ, অপার্থিব শক্তি, আধ্যাত্মিকতার অতুলতৃপ্তি অবশ্যই আছে, নচেৎ এতদিন সমানভাবে

কখনও নিজের মর্য্যাদা রাখিতে পারিত না; মিথ্যা হইলে জলবিম্বের মত কবে বিলীন হইত, এত পুরাতন হইয়া কখনই এত নূতন থাকিত না।

প্রকৃত গুণ না থাকিলে, কেবল মাত্র সমাজ উৎসব হইলে, এতদিন ইহাকে কাল আপনার বিশাল গর্ভে শুধু স্মৃতিটুকু রাখিয়া বিলীন করিয়া লইত সন্দেহ নাই।

যেমন কাব্যের সমালোচনা সমালোচকেরা করুন বা নাই করুন, তাহাতে কাব্যের কিছু আসে যায় না। যে কাব্যের গুণ থাকে, সহস্র সমালোচনার তীক্ষ্ণতম আঘাতে আপাততঃ বিধ্বস্ত ও ম্লান বোধ হইলেও সময়ে সে আপনার গুণ প্রকাশিত করিবেই করিবে। ধূমে আবরিত বহ্নি এক সময়ে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিবেই করিবে। যে কাব্যের গুণ নাই, অজস্র তোষামোদের অসংখ্য বিজ্ঞাপনস্তূপের মধ্যে থাকিয়াও সে আপনাকে স্থায়ীভাবে দাঁড় করাইতে পারিবে না; যাহার যতটুকু গুণ বা দোষ আছে, সমালোচনায় তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলেও ততটুকু গুণ বা দোষের পরিমাণ কালই করিয়া দিবে। তোমরা যাহাই কর না কেন? কাল ঠিক তাহার বাস্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে; কালের বিচারের নিকট দুইচারি জনের চেষ্টা আপাততঃ ফলদায়ক হইলেও সময়ে তৃণের মত উড়িয়া যাইবে।

এই প্রতিমাপূজার গৌরব গীতি কালই গাহিয়া আসিতেছে; ইহার গুণ, ইহার সত্যতা, ইহার আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কালই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। এ গীতি এমনভাবে হৃদয়ের সহিত

তাদাত্ম্যভাবে মিশিয়া আছে, এ স্মৃতি এরূপভাবে অন্তঃকরণে গাঁথা আছে যে, দেহ হইতে মন পৃথক্ না করিলে ইহা লুপ্ত হইবে না; এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহার স্মৃতি পর্য্যন্তও এখন বর্ত্তমান নাই।

এই প্রতিমাপূজা কি? মন পার্থিব পঞ্চ ভূতের পরিণাম স্বরূপ। দধি মন্থন করিলে যেমন তাহার সূক্ষ্মাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ ভুক্তান্ন উদরাগ্নি ও বায়ুদ্বারা মথিত হইলে পর যে সূক্ষ্মাংশে পরিণত হয় তাহাই মন। সেই মনের গতি দূরপ্রসারিণী হইলেও অদৃষ্ট বস্তুর ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্যই সেই অদৃষ্ট বস্তুকে দৃষ্ট বস্তুর আকারে আনিতে হয়। নিরাকার সচ্চিদানন্দ ভাব, মন বুদ্ধি বা কল্পনার অতীত, সেই জন্যই আমাদের মৃত্তিকাস্তূপবৎ জড় অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না; তাই একটি ক্ষমতাসাধ্য সান্ত-চিন্তাশক্তি-গম্য অবলম্বন স্থির করিতে হয়। সান্ত-চিন্তাশক্তি কখন অনন্তের ধারণা করিতে পারে না। কারণ তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

একটি কথা উঠিতে পারে যে, বেদ, উপনিষৎ অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছে; না তাহা পারে নাই। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে "ব্রহ্মে যে সমস্ত অবাস্তব ধর্ম্ম কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্ম নহে" বেদ উপনিষৎ ইহাই বুঝাইয়াছে। "নেতি নেতি" ইহা ব্রহ্ম নহে, অবিদ্যা আরোপিত কোনও বস্তু ব্রহ্ম নহে; এইরূপ ভাবে বুঝান ভিন্ন প্রকৃত ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান হয় নাই।

তবে সেই অনির্দ্ধারিত, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা করা অবিস্তাকার্য্য মনের দ্বারা সম্ভব নহে বলিয়া একটী সহজ সাধ্য অবলম্বন স্থির করিতে হয় এবং তাহাতে একাগ্রতা শিক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ ও মানসগ্রাহী হইয়া থাকে। মন যদি অনির্দ্দিষ্ট ধারণা ও কল্পনার অতীত অনন্তের পানে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান না পাইয়া অবসন্ন হইয়া স্বস্থানেই ফিরিয়া আসিবে। রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন ছুটিতে ছুটিতে রজ্জু আকর্ষণে শাকুনিক হস্তেই ফিরিয়া আইসে, তদ্রূপ মনও অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান না পাইয়া প্রাণকেই লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া বসে এবং তাহাতে আরও বদ্ধ হয়। ইহাই সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম। লক্ষ্যভেদশিক্ষার্থী প্রথমে স্থূল বিষয়েই লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে; তদ্বারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে। আর এই অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ, অজ্ঞের কারণ স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে লক্ষ্য বিষয়ীভূত করিতে হইলে অগ্রে স্থূল বাহ্যবস্তু অবলম্বন স্বরূপ স্থির করিতে হয়। একটি অত্যুচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে প্রথমে স্থূল সোপান, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

কার্য্যজ্ঞানে কারণের জ্ঞান, কার্য্যলিঙ্গে কারণের অনুমান; এইরূপে প্রথম কার্য্য দেখিতে হইবে, তাহার উপাসনা করিতে করিতে পরিশেষে কারণে পৌঁছিতে হইবে; সমুদ্রে পৌঁছিতে হইলে অগ্রে নদীমুখ দিয়া যাইতে হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, সলিল আর সশৈলকাননা পৃথিবী

সকলই সেই এক পরম কারণের কার্য্যমাত্র। এই কার্য্যের ভিতর দিয়াই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। এই কার্য্যের শক্তি দেখিয়া তাঁহার শক্তির অনুমান করিতে হইবে। এই কার্য্যের আপেক্ষিক পূর্ণতা অনুমানে দেখিয়া প্রকৃত পূর্ণতার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে হইবে।

যাঁহাকে জানিলে কিছুই জানিবার বা বুঝিবার আবশ্যকতা নাই কিম্বা আর কিছুই জানিবার বুঝিবার থাকে না, তাঁহাকে জানিলে অবশ্য পৃথক্‌ভাবে এই কার্য্যজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে উন্নত তত্ত্বের ধারণা সাধারণের অতীত বলিয়াই এইরূপ বলা হইতেছে।

প্রকৃতির জ্ঞান না হ'লে কখন,
না হবে ধারণা ব্রহ্মই কেমন।
না বুঝিলে ধরা, স্বরগ কেমন—
কেমনে বুঝিবে মানবচয়।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, প্রতিমাপূজারূপ স্থূল লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার পর কাহাকেও সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ করিতে দেখি না, এমন কি সে ইচ্ছাও দেখি না, বরং উত্তরোত্তর আরও স্থূলে জড়িত হইয়া পড়েন।

সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ কারিকা শক্তি যে এক জন্মেই লাভ হইবে এমন কোন কথা নাই। আমরা সভক্তিক অন্তঃকরণে যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করি না কেন, আকুলস্বরে যে নামেই তাঁহাকে ডাকি না কেন, তাঁহার দয়া থাকিলে তিনি আপনিই আমাদের

এ ভ্রম দূর করিয়া দিবেন ; লবণ পুত্তলিকা সমুদ্রে যাইলেই সমুদ্রে মিশিয়া যায়, আমরাও "ভক্তিনাবং সমাসত্য" যদি তাঁহার নিকট যাইতে পারি, আর যদি তাঁহাতে বিলীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করি, তিনি আপনিই বুঝাইয়া দিবেন যাহা করিতেছ, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥

তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী সকল স্থানেই থাকেন, তিনিই যখন আদর্শে প্রতিবিম্বের মত জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, আমরা যদি সে উচ্চ ধারণা করিতে না পারি বা তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তিনি ইচ্ছা করিলে যে আমাদের ধারণাযোগ্য বুদ্ধিগম্য অনুভাব্য রূপে আসিতে পারেন না, বা আমাদের দৃষ্টিগোচরীভূত তাঁহারই সৃষ্টকার্য্যের কোন একটি বস্তুর আকার ধরিতে পারেন না বা কোন বস্তুর আকার ধারণ করিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার শক্তি রাখেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা হয় ও ঐশ্বরীয় শক্তির সঙ্কোচ করা হয়।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই যে, কেহই পারেন না বা পারিতে সক্ষম নহেন, এমন কথা বলিলে আমাদেরই অযোগ্যতা তাঁহাদের উপর আরোপ করা হয়। তবে দুই এক জন পারিলেও তাহা কখন সাধারণ গ্রাহ্য হইতে পারে না বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মোপাসনা

কথনই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হয় নাই বা তাহা লইয়া কখনই স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

তবে সাধারণের পক্ষে নিরাকার নিরিন্দ্রিয় নির্গুণ নিক্রিয় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিবার আশা, পক্ষীর সমুদ্র জল শোষণেচ্ছার মত। এই কারণে সগুণ, সাকার, মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়। অঘটনঘটনপটীয়সী শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা মায়ার সহযোগে যে ব্রহ্ম সগুণ হয়েন,—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—লীলাদেহ ধারণ করেন, তাহা আরও সরল আরও মানসগ্রাহী।

প্রতিমাপূজা একাগ্রতা সংস্থাপনের সুন্দর উপায়।—প্রতিমা খড়মৃত্তিকার সমষ্টি বলিয়া অনেকে উপহাস করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ ভাবে দেখেন তবে জানিবেন, বাস্তবিক প্রতিমা. আকাশ সলিল বায়ু ও পার্থিব বস্তুর সমবায়ে গঠিত এবং ইহাও একটী কার্য্য। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু আদি যেমন তাঁহার কার্য্য, তেমনই এই সামান্য তৃণখণ্ডটী তাঁহারই কার্য্য। তিনি যখন সর্ব্বভূতেই আছেন—জগৎই তাঁহার রূপ, তখন সামান্য তৃণখণ্ড ও সামান্য ধুলিকণাতেও আছেন; যখন জগৎই তাঁহার রূপ, তখন সামান্য তৃণখণ্ডাদিও ত জগৎ ভিন্ন নহে। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞানে যাঁহারই উপাসনা করা হউক না কেন, তাঁহারই উপাসনা হইবে। ঘটান্তবর্ত্তী আকাশ ও অখণ্ড আকাশ উভয়ই আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ঘটাকাশ বুঝিলে সম্পূর্ণ আকাশ বুঝা না যাউক, কিন্তু আকাশ বুঝা ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। তবে কথা এই যদি উপলখণ্ডকে উপলখণ্ডই ভাবি বা তাহাই মাত্র বুঝিয়া উপাসনা করি, তাহা

হইলে তাহা সত্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কোনও হিন্দুসন্তান এরূপ ভাবে উপাসনা করেন না; কে না জানে, পরমেশ্বর এক ও সর্ব্বত্রই আছেন; এমন কে অশিক্ষিতা জ্ঞানশূন্যা মহিলা আছে, যে হিরণ্যকশিপুর কথার উত্তরে প্রহ্লাদের সে উক্তি—"এ স্তম্ভের ভিতরেও হরি আছেন।"—এ কথা না জানে!

ঈশ্বর ভূতে ভূতে চৈতন্যাকারে অবস্থিত একথা সকলে বুঝে না বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে। আমরা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ মানিয়া চলি, সুতরাং আমরা কর্ম্মবাদী। যদি আমরা আত্মজ্ঞানী হইতাম যদি আত্মা কি বুঝিতাম তাহা হইলে কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। আমরা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারীও হইতাম না। আর যদি দেহেই প্রকৃত আত্মবুদ্ধি থাকিল, যদি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সংঘাত বস্তুকেই কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতে হইল, তবে ত দেহ নাশান্তে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা থাকে না, তবে ত পরলোক কি জন্মান্তর মানা চলে না; তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত-বিধি-নিষেধ অনুসারে দেহাত্মবাদী চলিতে পারে না। তবেই বিধি নিষেধের কর্ত্তার অসদ্ভাব হইয়া পড়িল। আমরা দেহাত্মবাদী তবে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অনুসারে চলি কেন?

আমাদের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস আছে তাই আত্মস্বরূপানভিজ্ঞ হইয়াও আমরা পরলোকে বিশ্বাসী, আমরা কর্ম্মফলে জাততৃষ্ণ বলিয়াই শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারী।

আমাদের প্রতিমাপূজাও সেইরূপ। সমস্ত পদার্থ হইতে অভিন্ন এমন কথা বুঝি না, বা সকল পদার্থেই তিনি আছেন, এরূপ ধারণা করিতে পারি না, তথাপি ইহা বিশ্বাস করি, এই স্থানেই আবির্ভূত হইতে পারেন; এরূপ ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান্ নহি।

তিনি যখন সর্ব্বভূতেই আছেন, তবে আবার শিলাপ্রতিমাদিকে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদ্বারা ঈশ্বরত্বে পরিণত করিবার বৃথা আশা কেন? সে শক্তির অভিমানই বা কেন? মনুষ্যের শক্তি কি ঐরূপ হইতে পারে?

প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ধর, সূর্য্যরশ্মি এই বস্ত্রের উপর পড়িয়াছে কিন্তু দগ্ধ করিতেছে না, কিন্তু আতসী কাচদ্বারা সূর্য্যরশ্মি একীভূত করিয়া আকর্ষণ কর, তখন ঐ বস্ত্র দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না, ঐ রশ্মির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইরূপ এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও চৈতন্য ছিল, কিন্তু আমরা সভক্তিক নির্ম্মল মনোরূপ আতসী কাচ দ্বারা সেই চৈতন্যকে (যাহা অনমুভূত ছিল) আমাদের ধারণাযোগ্য ও চিন্তাশক্তিগম্যভাবে অনুভব করি। অর্থাৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে চৈতন্য,—আমাদের নিকট অনুভূত ছিল; পরে তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে মাত্র। এই মন ও চৈতন্য, এই উভয়ের মাঝখানে এমন একটি দূরত্বজনিত ব্যবধান পড়িয়াছিল, যে ব্যবধান টুকু না সরাইতে পারিলে আমরা আমাদের ধ্যেয় বিষয়ে মন দিতে পারি না। যে সকল প্রতিকূল যুক্তিসত্ত্বেও

আর্য্যঋষিগণ প্রতিমাপূজা ব্যবস্থিত করিয়াছেন, যে সকল যুক্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই সকল যুক্তিই আধুনিক প্রতিমা বিরোধিগণের একমাত্র সম্বল।

আধুনিক প্রতিমাবিরোধিদলের এ সম্বন্ধে এই যুক্তি যে, নিরবচ্ছিন্ন বস্তু সাবচ্ছিন্ন করা, আর ব্রহ্ম-উপাসনার বিস্তীর্ণ উদারতাকে প্রতিমাপূজারূপ সঙ্কীর্ণতায় পরিণত করা, একই কথা।

আবাহন অর্থে জাগরণ, যিনি সর্ব্বদা জাগ্রত, তাঁহার আবার জাগরণ কি? তিনি জাগ্রত বটে, কিন্তু আমরা যে মহানিদ্রায় সুপ্ত, আমাদের নিকট তিনি নিদ্রিতই বটেন, আমরা আমাদের স্বভাবজাত মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া যে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে সক্ষম হই, তাহাই হইল তাঁহার ও আমাদের জাগরণ। বিষয়-বাসনা মুগ্ধ, অবিদ্যাবদ্ধ অন্তঃকরণকে, কিছুকালের জন্য বিষয়াভিমুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যবস্তুতে স্থির করিতে হইলে যে প্রক্রিয়া তাহাই আবাহনাদি।

এই লক্ষ্যভেদে. বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ধনু, একাগ্রতা তাহার শর, ভক্তি সন্ধানের চেষ্টা, অগ্নির তাপক্রিয়ার তুল্য, জ্ঞান ইহার স্বরূপ ফল মাত্র। উপাসনার এমন উৎকৃষ্ট প্রণালী আর কিছুই নাই। যিনি দশভুজারূপ ব্রহ্মশক্তির আরাধনা স্থির করিয়াছেন, তিনি একাধারে চিত্রকর কবি ও মহাপুরুষ।

এইটী তাঁহাদের ভ্রান্তি, নিরবচ্ছিন্ন বস্তুকে কখন সাবচ্ছিন্ন করা যায় না বা ব্রহ্ম-উপাসনার উদারতাকে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত করা সম্ভব নহে। যে ব্রহ্ম অখণ্ড নিরাকার, সচ্চিদানন্দই যাঁহার স্বরূপ,

সেই নিরবয়বের আবার অবিচ্ছন্নতা কি? যাঁহার আকার নাই, তাঁহাকে আকারে পরিবর্ত্তিত করা কি সম্ভব? আমরা এরূপ আকাশে কুসুম উৎপত্তির মত, অসম্ভব ব্যাপার সাধন করিবার শক্তি রাখি না; আকাশকে রবারের মত সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করিয়া তাহার দ্বারা পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারা যায় না। এরূপ অবাস্তব কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া নিজমত পুষ্ট করা যুক্তি-বাদিগণের কার্য্য নহে।

প্রতিমাপূজা যে ব্রহ্ম-উপাসনা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়, তাহা স্বীকার করি, কারণ, মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষেই ইহা বিহিত, উত্তমের পক্ষে নহে। যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি, (যথা, আমি স্থূল কৃশ, আমি সুন্দর, আমি কুৎসিত) অন্তঃকরণে আত্মভ্রম, (যেমন আমি সুখী, আমি দুঃখী) সেই সকল ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে প্রতিমাপূজারূপ সহজ উপাসনা বিহিত ও প্রশস্ত। যতক্ষণ আমি কর্ত্তা, উহা করণ, ইহা কর্ম্ম, তাহা একটি ক্রিয়া, এইরূপ অভিমান না যাইবে, ততক্ষণ ব্রহ্ম-উপাসনা প্রশস্ত ত নহেই, বরং অবিহিত, ইহা সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ও তাবৎ ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত।

উত্তমের পক্ষে ব্রহ্ম-উপাসনা, মন্দ ও মধ্যমের পক্ষে প্রতিমা-পূজাদি সনাতনশাস্ত্র-সম্মত সু-প্রণালীসিদ্ধ উপাসনা বিহিত। এ কথায় কাহারও আনন্দ বা দুঃখ করিবার নাই। আমরা যখন আপনাদিগকে মন্দ ও মধ্যম ভাবি, উত্তম ভাবি না, তখন ব্রহ্ম-উপাসনা করিতে অধিকারী নহি, এই জন্যই আমাদের নিকট

প্রতিমাপূজা শ্রেষ্ঠ; তবে যাঁহারা আপনাদিগকে উত্তম ভাবেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-উপাসনা করিতে পারেন, তাহাতে তিনি অধিকতর উপযুক্ততার জন্য সকলের আদরণীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে ঐ উপযুক্ততা চিত্তশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার মাতৃজঠরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। ভাবিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে প্রতিমাপূজা অবলম্বনীয় নহে। অপর, নদীমুখ দ্বারা তৃণখণ্ড যেমন সমুদ্রে যাইয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রতিমাপূজাদি সহজ উপাসনার দ্বারা ক্রমে সেই অনন্তের ধারণায় সিদ্ধকাম হওয়া যায়। তবে যদি এমন কাহাকেও দেখা যায় যে, জ্ঞান সঞ্চারেই প্রহ্লাদের মত "ক" এই কথাটি শুনিয়াই কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন, বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব জন্মে তিনি ঐ সহজ-উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিয়াই দেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ইহ-জন্মে তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবেন, কারণ সৎ কর্ম্মের বিনাশ নাই। তবে কেবল-মাত্র নিজের অবিবেককে বিবেক মনে করিয়া, বিদ্যাবুদ্ধিজাত ভাববিকাশকে ধর্ম্মবাণী স্বরূপ ভাবিয়া, অজ্ঞানের কার্য্য জ্ঞান-স্ফুরণ অবধারণ করিয়া, যিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারেই চলেন, তিনি এই সকল ভ্রান্তজ্ঞানকেই যোগ্যতর কারণ স্থির করিয়া লয়েন ও তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়েন।

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকেরা আভিজাত্যের গৌরব করেন না, বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কার করেন না, কোন বিষয়েই অভিমান করিতে পারেন না। কেবল মাত্র উপবীত ত্যাগ বা সকল জাতির সহিত

ভোজনাদি করিলেই অভিমান ত্যাগ হইল না। অর্থ বিদ্যা সম্মানগত অভিমান রহিল, নিজেরা উত্তম জ্ঞানী, শিক্ষিত—এ অহংজ্ঞান অস্থি মজ্জায় জড়িত থাকিল কেবল মাত্র দুই একটি ত্যাগ করায় সে ক্ষমতা কাহারত হয় না, "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ" এ মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া সহজ কথা নহে। "শ্রুতি বলেন, "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত" সমব্যক্তিকে (ব্রাহ্মণদিগকে বিষম (শূদ্রবৎ) মনে করিলে, বিষমকে (শূদ্রকে) সম (ব্রাহ্মণ) জ্ঞান করিলে, ইহপরকাল চ্যুত হইতে হয়। তবে যে গীতা বলেন :—

বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত মন শুদ্ধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববিধি অনুসারেই চলিতে হইবে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সমজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই সর্ব্বভূতে তুল্যজ্ঞান স্বাভাবিক। যাঁহারা উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণকে সমজ্ঞান করিতে পারেন না, বিষ্ঠাবাহী মেথর ও শববাহী চণ্ডালকে নিজের আসনে বা পর্য্যায়ে বসিতে দিতে পারেন না, তাঁহারাই সাম্যজ্ঞানের পরিপোষক হয়েন এবং গীতার ঐ মহামহিম জ্ঞানের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

অথচ আজিকালিকার প্রতিমাপূজা বিরোধীরা সাম্যজ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিমা পূজাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, উত্তমাভিমানী, তাঁহাদের

কর্ত্তব্যকার্য্যের উপর কটাক্ষপাতও (মনুষ্যের স্বভাব বলিয়া) আমরা করিয়া থাকি। যিনি ব্রহ্মোপাসনার অসীম ও অনন্ত সলিলরাশি সন্তরণ দিয়া পার হইবার আশা করেন, তাঁহার মহতী আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহার গতির উপর স্পৃহনীয়-লোচনে তাকাইয়া থাকি, দেখি, তিনি পার হইয়া উন্নত তত্ত্বের নিকট যাইতে পারেন, কি সলিল মধ্যে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহারা যদি আপনার শক্তি বা জ্ঞানের অনুযায়ীকার্য্য না করিয়া বিফলমনা ও অধঃপতিত হয়েন, তাহাতে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি? তবে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হইলে বন্ধুচিত্ত অনিষ্টাশঙ্কী বলিয়াই বারণ করি, পাছে তাঁহার ক্ষতি হয়। আর "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাং" এই নীতি অনুসারে দুই একটি অনাবশ্যক বাক্যমাত্র-সার উপদেশও দিয়া থাকি। কারণ বিংশশতাব্দীর সভ্যযুগে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই উপদেষ্টা হইবার দাবী করিতে পারেন।

অনেকে প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ও সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা পাছে ভ্রমে পড়েন, ইহা হিন্দুসন্তানের বাঞ্ছনীয় নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার সত্ত্বগুণের খেলাকে মনবুদ্ধির সদসদভিসন্ধিতাকেই ভগবদনুগ্রহ বা জ্যোতি দর্শন হইল ভাবিয়া প্রতারিত হয়েন, এই ভ্রমাত্মক অবস্থায় মুমুক্ষুর পতন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জাগ্রদ্বাসনার স্মৃতি সকল পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার নিচয়, অসত্যপথকে সত্য পথ বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তখন অবিবেক বিবেক নাম ধারণ করিয়া, কুমতি

সুমতি নামে পরিচয় দিয়া, স্বল্প জ্ঞানী ধর্ম্ম পিপাসুকে মরীচিকা দেখাইয়া মুগ্ধ করে।

এইরূপ নানা কারণে, নানাদিগ্‌দর্শী মহর্ষিগণ—প্রতিমার কল্পনা করিয়া সাধারণের সাধনমার্গ সরল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—"পরিপূর্ণতার" ইয়ত্তা করা বড়ই কঠিন, তাই পরমব্রহ্মের ধ্যানধারণাকে খণ্ডশঃ বিভক্ত করিয়া সেই খণ্ডকেই তাঁহারা আয়ত্ত করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে সম্পূর্ণ সমুদ্রকে ধারণা করিতে পারে না, সমুদ্রের একাংশ দেখিলে তাহার সমুদ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে। ভগবানের অনন্ত মহিমা একেবারে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত অবয়ব ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত করিলে স্বরূপ জ্ঞান সহজলভ্য হয়। আংশিকজ্ঞান জন্মিলে পূর্ণজ্ঞান—অনায়াসেই আয়ত্ত হইয়া যায়। ইহাই আমাদের প্রতিমাপূজা!

আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা আধুনিক যুগের অনেক লোকের কাছে—"পৌত্তলিক" বলিয়া কলঙ্ক কিনিয়াছি। আমরা প্রতিমা পূজা করি, কাজেই আমরা অসভ্য, কিন্তু বল দেখি ভাই! এ বিরাট বিশাল বিশ্বে—কোন্ জাতি প্রতিমা পূজা করে না? তুমি বৌদ্ধ—কিন্তু তোমার ঐ যে ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি অনুরাগ—উহা কি প্রতিমাপূজা নয়? তুমি খৃষ্টিয়ান! তোমার ঈশ্বর বলিয়াছেন—"আমা ভিন্ন অন্য দেবতা না থাকুক।" তুমি কি তোমার ঈশ্বরের এই আজ্ঞা পালন করিয়া থাক? তবে তোমার কক্ষ গাত্রে—ক্রুশ বিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি লম্বিত কেন? তুমি

ঐ কণ্টককিরীটশীর্ষ যীশুমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ সিক্ত কর কেন? প্রকারান্তরে ইহাই কি তোমার প্রতিমা পূজা নহে? তুমি বৈজ্ঞানিক, একটি প্রস্ফুট কুসুমের প্রতি চাহিয়া—তুমি আত্মহারা হইয়া স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যে মুগ্ধ হও কেন? বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্ত্তি দেখিয়া বৌদ্ধের যেমন সিদ্ধার্থকে স্মরণ হয়, ক্রুশ বিদ্ধ মেরিনন্দনকে দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ানের যেমন সেই পিতা পুত্র—পবিত্র আত্মাকে মনে পড়িয়া যায়, দুর্গা, শ্যাম, শিবের বিগ্রহ দেখিয়া আমাদেরও তেমনি পরম ব্রহ্মের অপার মহিমা স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতেছিলাম—প্রতিমা পূজা করে না কে? প্রকারান্তরে সকলেই পৌত্তলিক॥

বেদান্ত ধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক মধুসূদন সরস্বতী আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা কি অতুলনীয় আবেগের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কেচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু লোচন-চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং তমো ধাবতি॥

ধ্যানাভ্যাস-সুনির্ম্মল অন্তরে যে যোগী—
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পারেন ভাবিতে,
ভাবুন, তাঁহারা তবে; আমরা কখন
কালিন্দী বিহারী শ্যাম পদ্ম-কোকনদ
ভুলিব না নিরবধি পূজিব হরষে॥

মৈত্রেয়ীর আত্মশ্রবণ।

একদিন যাজ্ঞবল্ক্য আপনার প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বল্লেন "মৈত্রেয়ি! আমার প্রিয়তমা মৈত্রেয়ি! আজ আমি আমাদের খেলার ঘর, যৌবনের প্রমোদোদ্যান, বার্দ্ধক্যের স্বর্ণ যষ্টি সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাব। তুমি তোমার সপত্নী কাত্যায়নীকে ডেকে নিয়ে এস, যাদের আমি আপনার ব'লে ভালবাসতেম্, আপনার সমস্ত প্রেম দিয়ে যাদের জীবিত রেখেছিলেম, সেই নয়নানন্দদায়িনী তোমাদের ত্যাগ ক'রে আমি আপনার প্রকৃত কাজ কর্ত্তে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি ; অনুমতি দাও, হাস্তে হাস্তে সম্মতি জানাও, তোমাদের কিন্তু চোখের জল পড়্লে আমার কোন কাজ সিদ্ধ হবে না ; তোমাদের মর্ম্মভেদী নিশ্বাস আমার সর্ব্বত্যাগের ভিতর ফুটে উঠবে। আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি, সঞ্চিত ধনরত্ন তোমাদের দুজনাকে আজ ভাগ করে দিয়ে যাব।

মৈত্রেয়ী। স্বামিন্! এই সমস্ত পৃথিবী ধনরত্নে পূর্ণ ; আর সকল মানবই দিনরাত এই ধনরত্নের উপাসনা কচ্চে, ইহার দ্বারা আপনাদিগের অভীষ্ট অনায়াসে সাধিত ক'রে নিচ্চে। আর ধনরত্নে, ধনরত্নসাধ্য যজ্ঞে, কি আপনার অভীপ্সিত কাজ সাধিত হয় না ? আকাঙ্ক্ষিত অমৃত লাভ কি করা যায় না ?

যাজ্ঞ। তা হয় না মৈত্রেয়ি! শিশির দিয়ে রন্ধন কাজ চলে না, অজ্ঞানের আঁধার নাশ ক'রে পরম পদে পৌছিতে হ'লে জ্ঞানের আলোক ছাড়া আর কি উপায় মৈত্রেয়ি!

মৈত্রে। তবে এ অর্থে কাজ কি স্বামিন্! অজ্ঞানের নাশ কর্ত্তে কেন আর একটা লোভময় অজ্ঞানের সুখ জালে জড়িত হয়ে পড়ি। স্বামিন্! সেই জিনিষটি দাও, যাতে ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি জ্ঞান, মনের সংকল্পেচ্ছা, প্রাণের আকুলতা থাক্‌বে না, যে স্থানের টানে আমাদের ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব পতি দেবতাকে অধীর করে তুলেছে, আমাদের চির পরিচিত সঙ্গ, অন্তরের উচ্ছলিত ভালবাসা, আপনার যে প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পাচ্চে না, সেই অমৃত জিনিষটি কি উপায়ে লাভ হবে ব'লে দিন। আমি শিষ্যা আশ্রিতা, আমার আশা পূর্ণ করুন।

যাজ্ঞ। প্রিয়বাদিনি! এতকাল যে মিষ্ট কথায় সংসারের মর্ম্মভেদী কোলাহল শুনতে দাওনি, আজও এই সংসারের অন্তিম শয়নে, জীবনের সন্ধ্যাকালে সেই বীণাধ্বনিবং মিষ্ট কথা। এস মৈত্রেয়ি! তোমার বাসনা পূর্ণ করি, অমৃত লাভের বিষয় তোমাকে উপদেশ দিই। তবে এ কথাটি মনে রেখো, যা উপদেশ দিব, তার প্রত্যেক শব্দটি, শব্দের প্রত্যেক অর্থটি, অর্থের প্রত্যেক তাৎপর্য্যটি পর্য্যন্ত মন প্রাণের সহিত এক ক'রে অনুভব ক'রো; নিজের যাবতীয়

প্রাণপণ চেষ্টা, সকল চিন্তা সেই "একে"র সহিত তদাত্ম্যভাবে মিশিয়ে ফেল; পবিত্র শব্দের অস্ফুট বাক্য-গুলি নিজের কাণের সহিত বেশ ক'রে গেঁথে রেখে দিও। মৈত্রেয়ি! এই যে স্ত্রীর ভালবাসা শুনতে পাও, কাব্যের প্রতি ছত্রে তার গুণ গরিমার কথা প'ড়ে থাক, বৃদ্ধমুখে সতীর জলন্ত আত্মত্যাগের অমানুষিক কাহিনী শুনে আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠ;—তার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে বুঝিবে, সে প্রাণঢালা ভালবাসা পতির জন্য নহে, আপনার জন্য। পতি যে এত প্রিয় জানিও তা আপনারই জন্য। এই পুত্র কন্যা সবই প্রিয় কেন জান? আপনার জন্য, আপনার সুখ তৃপ্তির জন্য। ইহারা আপনার প্রতিচ্ছবি সেই জন্য। তবে এ "আপনার" কথাটি শরীর ইন্দ্রিয় বা কেবল মনকে বুঝিয়ে শেষ হয় না; এই কথাটি জগৎ হইতে উঠিয়ে দাও, দেখ্‌বে, সমস্ত প্রবৃত্তি নিমেষে বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে, রবি তারা গ্রহ শশী আর সুন্দর থাকবে না, সংসার বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। যে "আপনার" আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জগৎ এত প্রিয়, সে বস্তুটি যে কি তাহা ভাব্‌বার জিনিষ, ভাবতে ভাবতে "আপনার" তত্ত্ব ইয়ত্তা কর্ত্তে কর্ত্তে যখন দেখ্‌বে, যে বস্তু অবশিষ্ট থেকে যাচ্চে, যাকে সম্পূর্ণ অনুভব কর্ত্তে পাচ্চ না, অথচ ধরি ধরি মনে কচ্চ; সেই বস্তুটির ভাল নাম "আত্মা"।

মৈত্রে। আমি একটি আলোকময় সত্যের পথে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ এ যে অন্ধকার দেখছি। আমি যেমন করে বুঝতে পারি, তেমনি করে বলুন।

যাজ্ঞ। "আত্মা" এই মহান্ পবিত্র শব্দের ভিতর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব রয়েছে, ইহার মধ্যে যা নাই তা আর কোথাও নাই।

মৈত্রে। এই আত্মা সম্বন্ধে আমি ভালরূপ জানতে চাই। আপনি বলুন।

যাজ্ঞ। এই আত্মার বর্ণনা বড় সহজ নহে মৈত্রেয়ী!

"অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি"।

তর্ক, চিন্তা, কল্পনা যার স্বরূপ বুঝে না, স্বয়ং বেদান্ত যে আত্মস্বরূপ "নেতি নেতি" ব'লে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, তুমি তাই শুনবে, মন স্থির কর।

ইনি সকল বস্তুর অভ্যন্তরে থেকে তাদের জড়তাগুলি আপনার চৈতন্যময় স্বভাবের অধর সম্পর্শে চৈতন্যময় ক'রে তুলেছেন, অথচ ইনি সকল বস্তু হতে স্বতন্ত্র, সকল বস্তু ইঁহাকে কখনই জানতে পারে না বা কোন কালে পার্ব্বে তাহার কোনও সূচনা দেখা যাচ্চে না, এই দৃশ্যমান সকল বস্তুই তাঁর মায়াময় শরীর, ইনিই অচিন্ত্য চিন্ময়ী শক্তি দ্বারা এই সমস্ত বস্তুকে এমন করে নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছেন, যে কেউ কারো সনাতন পথ ত্যাগ করে না। কিন্তু প্রকৃত আত্মা

অকর্ত্তা, অপ্রাণ, অমনাঃ, নীরিন্দ্রিয় অশরীর, সকল প্রকার উপাধিহীন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসংনিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচ্যতে।

মৈত্রে। আত্মা বল্‌তে জীবাত্মা। কিন্তু এ বর্ণনা ত জীবাত্মার নহে. ঐ যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বর্ণনা।

যাজ্ঞ। জীবাত্মা ত একই আত্মার পৃথক্ বিকাশ মাত্র। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "যঃ সাক্ষাদ পরোক্ষাৎ ব্রহ্ম স আত্মা" আকাশে উঠলে বল আকাশের চাঁদ, শাখার ভিতর বল শাখার চাঁদ, জলের ভিতর বল জলের চাঁদ। কিন্তু চাঁদ একই।

মৈত্রে। এই আত্মা ব্রহ্ম, ইনিই আবার সচ্চিদানন্দময়। এ কথা কয়টির প্রকৃতিগত তাৎপর্য্য কি?

যাজ্ঞ। "অত" (ব্যাপ্তি) ধাতু হইতে আত্মা, অর্থ—ব্যাপক। "বৃহ" হইতে ব্রহ্ম, বৃহৎ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালাতীত। "সৎ" এই আত্মা বাঙ্মনসাতীত, রূপহীন, তথাপি যখন "আছেন" বলে উপলব্ধি হচ্চেন তখন প্রকৃতি আকারে সৎ। অথবা কূটস্থ নিত্য। "চিৎ" চৈতন্যস্বরূপ চৈতন্যাকারে জগদ্ব্যাপী। "আনন্দময়" "আনন্দ ময়ো হ্যেবাত্মা" "আনন্দংখলু ব্রহ্ম" ইনি আনন্দ স্বরূপ।

মৈত্রে। এই আত্মা কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি কচ্চেন, কি প্রকারেই বা এই জগতের পালন কচ্চেন, এ কথাটা খুলে বলুন।

যাজ্ঞ। তিনি ইচ্ছা কল্লেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কচ্ছপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত, ঊর্ণনাভের জাল বিস্তারের মত আপনার ভিতর থেকে অনায়াসে বাহির ক'রে দিতে পারেন, ইচ্ছার অবসানে ঐ রূপ সংহৃত কর্ত্তে পারেন, ইহাই সৃষ্টি ও প্রলয়। আবার মধ্যে মরুভূমে মরীচিকার মত, স্বপ্নের মত মিথ্যাভূত এই ভ্রান্ত অবস্থা রেখে দেন—সে কেবল পালনের মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য। তাই মোহকর ইন্দ্রজাল স্পর্শ করিয়ে জীবের অনাদি নিদ্রার ব্যবস্থা করেছেন।

মৈত্রে। তাঁর ইচ্ছা কি অন্তঃকরণের বৃত্তি, বাসনার নামান্তর? তবে তিনি সাকার?

যাজ্ঞ। না, তাঁর ইচ্ছা অঘটনঘটনপটিয়সী. ত্রিগুণাত্মিকা অনাদি অনন্ত; এ ইচ্ছা অন্তঃকরণের বৃত্তির মত অনিত্য নহে, ইহা সতী অসতী অথচ জগৎ প্রসূতি।

মৈত্রে। স্বামিন্, আমার ইহ পরকালের একমাত্র কর্ণধার, যা আমি শুন্‌ছি তা যে চন্দন হ'তে শীতল, মলয় হ'তে মৃদু, পারিজাত হতে সুগন্ধি, স্বর্গ অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ; এ যে সংসারের সার শান্তি, পরাতৃপ্তি, এ হ'তে জীব বঞ্চিত কেন? আমরাই বা বঞ্চিত ছিলেম কেন?

যাজ্ঞ। তারও কারণ ঐ অঘটন ঘটন পটীয়সী ইচ্ছা। অচিন্ত্য অব্যক্ত লীলা বৈচিত্র্য। ইহার স্বরূপ, ইহার অসীম সঞ্চার, ইহার অনন্ত লীলা মনুষ্যের সান্ত চিন্তা প্রণালীতে

ধরা দেয় না ব'লে অসতী। আবার প্রতি নিশ্বাসে ইহার সত্তা, এই অননুভাব্য অ-স্মৃতিগম্য ক্রীড়া দেখলে কে না বলবে যে, ইনি সতী। ইনি কখন প্রকাশশীলা আলোকময়ী, কখন রঞ্জনাত্মিকা আড়ম্বরময়ী, কখন বা মোহ বিষাদ রূপিনী আঁধারময়ী জড়তা, তাই ইনি ত্রিগুণা। দেখ, তোমাকে আমি ভালবাসি, ইহা সত্ত্বগুণের খেলা, কাত্যায়নী যদি ঈর্ষ্যা করে, তাহা রজোগুণের খেলা, আবার তোমাকে দেখে যদি কোন কামী পুরুষ অন্তরে ব্যথা অনুভব করে, উন্মাদ প্রায় হ'য়ে উঠে, তাহা তমোগুণের পরিণাম।

মৈত্রে। যাঁর ইচ্ছা এমন, না জানি সেই ইচ্ছাময় কেমন, আমি এখনও তাঁর মহিমা, তাঁর লীলা অনুধাবন ক'র্ত্তে পারিনি, এ জগতের সঙ্গে তাঁর কি যে সম্বন্ধ, তা এখনও বুঝতে পারিনি।

যাজ্ঞ। সমুদ্র যেমন আপনার বেলাভূমি অতিক্রম করে না, এই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত এই ত্রিলোক তেমনি নিজ মর্য্যাদা ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে না। এই ইচ্ছাময় প্রাণময় আত্মা, ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত প্রাণহীন সকল পদার্থকে জীবন দিয়া সজীব ক'রে রেখেছেন, তাঁহারই অব্যক্ত-সুরে জড়যন্ত্র স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সুরময় হ'য়ে উঠেছে; বিশৃঙ্খল সচ্ছিদ্র পরমাণু তাঁরই অঙ্গুলিস্পর্শে সীমাবদ্ধ বিশৃঙ্খলাহীন হয়ে আছে।

মৈত্রে। এ যেন কল্পনার অসীম রাজত্ব, কবিত্বের কুসুম কানন, ভাবের অতল বারিধি, অলঙ্কারের স্তূপরাশি। প্রভু, আপনি বুদ্ধিগম্য, সংযত, অলঙ্কারহীন বাক্যে বুঝিয়ে দিন, যুক্তির ভাষায় বল্‌তে থাকুন।

যাজ্ঞ। দেখ মৈত্রেয়ি! মনে আছে "অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ" সে সময়ে কি ভাষা থাকে? কথার শৃঙ্খলা থাকে, সে যে সীমাহীন অতল বারিধি! আর এই যা শুন্‌চো, এমন কোন ভাষা নাই, কল্পনার এমন কোন শক্তি নাই, অলঙ্কারের এমন কোন ধ্বনি নাই যে, সংযত, শৃঙ্খলাভাবে, যুক্তিগম্য ক'রে বুঝিয়ে দিবে। আবার এমন ভাষা, কল্পনা, অলঙ্কার বা ভাব নাই, যা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'তে পারে না।

মৈত্রে। একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পাচ্ছি না। তাঁর ইচ্ছা ত্রিগুণাত্মিকা, বৈষম্যরূপা, অনন্ত-শক্তিময়ী, তবে তিনি নির্গুণ, অক্রিয় কেন? আর, যে মায়া বন্ধনে সকলে বদ্ধ, যে মায়ানিদ্রায় সকলে সুপ্ত, সে মায়া দ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট হয়েন না কেন?

যাজ্ঞ। সাপের দন্তকোষে বিষ থাকে, সে বিষে জীবের মৃত্যু হয়, কিন্তু সে বিষে সাপের কি? এ মায়া কিভাবে থাকে জান? যেমন পদ্মপাতায় শিশির থাকে, মরুভূমে মরীচিকা থাকে, আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর থাকে; তবে এ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা তিনি সগুণ সাকার হ'লেও,

রূপবান্ মায়াময় শরীরে, ভক্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ'লেও, প্রকৃত তিনি নির্গুণ, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অদৃশ্য। শ্রুতি এই ব'লে স্তব করেছেন "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো"। মৈত্রেয়ি! একবার মানসচক্ষু উন্মিলন ক'রে জগতের পানে তাকাও, তখন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বভূতস্রষ্টা মহা-মায়াবীর আংশিক তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্ব্বে। এই যে সামনের জিনিষ দেখ্‌ছ, আমার কথা একমনে শুন্‌ছ, উপনিষদের পবিত্র ভাব গাম্ভীর্য্যের ইয়ত্তা ক'র্ত্তে চেষ্টা পাচ্ছ, এ সবই বিশ্বনিয়ন্তার লীলা। দেখ্‌তেও ইনি, দেখাতেও ইনি, শুন্‌তেও ইনি, শুনাতেও ইনি, ইনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই বা শ্রোতা নাই।

মৈত্রে। তবে "অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং" বল্লেন কেন?

যাজ্ঞ। তার অর্থ, তিনি শব্দস্বরূপ, "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং"। তিনি না থাক্‌লে কাণের সাধ্য কি যে, শব্দ শুনে। তাঁর চৈতন্য-স্পৃষ্ট না হ'লে চক্ষু কর্ণ সকল ইন্দ্রিয়ই ইষ্টক চূর্ণের মত শক্তিহীন হ'য়ে পড়্‌ত। তবে এই যে বাহ্য-শব্দ, যা আমরা নিয়তই কাণে শুন্‌তে পাই, সে শব্দের শ্রোতা ব'লে আত্মাকে শ্রোতা ব'লে থাকি, সেটা ভ্রান্তি। শ্রবণ দুই প্রকার, একটি নিত্য শ্রবণ। আর একটি অনিত্য শ্রবণ। আর এই নিত্য শ্রবণই আত্মার ধর্ম্ম। রূপও তাই। বাস্তবিক তাঁর রূপ না থাক্‌লেও এ জগতে

যা কিছু দেখ্‌তে পাও—সকলই তাঁর রূপ। যাকে আমরা "বর্ণ" বলি তা রূপ নয়।

মৈত্রে। "অরূপ অশব্দ অপ্রাণ আকার হীন; তবে আবার নিত্যদৃষ্টি নিত্যশ্রুতি নিত্যমতি কিরূপ? এ যে গমন অবস্থানের মত, আলো অন্ধকারের মত পরস্পর বিরোধী হ'য়ে পড়্‌লো।

যাজ্ঞ। এই নিত্যদৃষ্টিই বল, নিত্যশ্রবণই বল, আর নিত্য শক্তিই বল, এ সমস্ত তাঁর উপাধি মাত্র।

মৈত্রে। উপাধিটি কি?

যাজ্ঞ। শুভ্র স্ফটিক পাত্রে রক্তপদ্ম রেখে দাও, দেখ্‌বে, সে শুভ্র স্ফটিক পাত্র রক্তবর্ণ ব'লে বোধ হবে, ইহাই উপাধি।

মৈত্রে। আপনি বল্‌ছেন, এই আত্মা (বহু স্যাং প্রজায়েয়ং) জগদাকারে আপনাকে প্রকাশ করেছেন; আবার বল্‌ছেন, এই জগতের অভ্যন্তরে থেকে জগতকে চৈতন্যময় করে তুলেছেন। এ দুইটি ত পরস্পর বিরুদ্ধ।

যাজ্ঞ। তিনি "বহুস্যাং প্রজায়েয়ং" জগদাকারে আপনাকে প্রকাশ করেছেন; কিন্তু যখন আমরা মায়ার রঙ্গীন চসমা চক্ষে ধারণ করেছি, তখন "এ জগৎ" "এ আমরা" সবই পৃথক্ বলে মনে কচ্চি। যখন পৃথক্ বলে মনে কচ্চি, তখন পৃথক্ ভাবেই বুঝ্‌তে হবে, এবং সত্য ব'লে ধারণা রেখে নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ সাধন ক'র্ত্তে হবে। ইহাই হচ্চে ব্যবহার দশার সত্যজ্ঞান। এই দশায়

যখন আমরা রয়েছি, তখন ইহার নিয়ম মেনে চল্‌তে হবে ; যে রাজ্যে বাস, সেই রাজ্যের নিয়ম মেনে চলাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। যদি পৃথক্ ভাব, তবে তাতেই চৈতন্যাকারে অভ্যন্তরে আছেন ভেবে লও। মোট কথা, যেমন করে বুঝ্‌তে যাবে, তিনি তেমনি আকারে আছেন। জগতকে শূন্য মনে কর, সেই মনে কর্‌বার কারণ তিনিই।

মৈত্রে। "তিনি জগদাকারে" তবে জগতকে জড়, আত্মাকে চৈতন্য বলে কেন ?

যাজ্ঞ। তোমরা বোঝ ব'লে তাই জড়। তিনি চৈতন্যাকারে, এ জ্ঞান থাকলে জড় চৈতন্য বিভাগ থাক্‌বে না। জীব জগৎ ও আত্মা একই হয়ে প্রকাশ পাবে। ইহাই পারমার্থিক দশা। এই দশায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

এ বিষয়ের উপনিষদের একটি উপদেশ শুন। এই সংসার বৃক্ষে দুইটি সুশ্রী, সুন্দরপাখাযুক্ত পক্ষী বাস করে। একটি উপরে, অপরটি নিম্নে। নিম্নের পক্ষীটি কর্ম্মফল ভোগ ক'র্চ্চে, সেটী জীবাত্মা। উপরের পক্ষীটি সাক্ষী স্বরূপ শুধু তাহাই দেখ্‌ছেন, সেটি পরমাত্মা ক্রমে নীয়ের পক্ষীটি উপরে উঠ্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে, যতই উপরকার পক্ষীর নিকটস্থ হ'ল, ততই ভাবতে লাগল, যেন আমি উপরিস্থ পক্ষীর অংশ মাত্র, উহারই তেজে

তেজস্বী, উহারই শক্তিতে শক্তিমান্। যখন খুব নিকটে গেল, ততই যেন সে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ল, কিন্তু যেমন স্পর্শ ক'র্‌লে, অমনি সাগরে বুদ্বুদের মতন মিলিয়ে গেল, আর তখন নিজের পৃথক্ সত্তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না। যারা দেখ্‌ছিল, তারা বুঝ্‌লে যে, উপরিস্থ পক্ষীর প্রতিচ্ছবি মাত্র পড়েছিল।

মৈত্রেয়ী যে সব কথা শুন্‌লে ইহাকেই বেদে বলে শ্রবণ। আর এই গুলি বেশ বিশুদ্ধ মনে বিচার ক'রে চিন্তা ক'র্‌লে পর যেটি বুঝ্‌বে, তাহাই মনন। আর যখন এ গুলি কার্য্যক্ষেত্রে উপলব্ধি ক'র্‌বে, ধ্যানস্তিমিত-লোচনে সে অপূর্ব্ব রসের আকাঙ্ক্ষায় সমাধিতে বস্‌বে, তাহাই নিদিধ্যাসন।

আত্রেয়ীর দীক্ষা।

"পঞ্চাশদূর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে সনন্দ বানপ্রস্থাশ্রমে যাবার মনস্থ কল্লেন, সে কথা শুনে তাঁর প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী সজলনয়নে সনন্দের সাম্নে উপস্থিত হ'লে, সনন্দ সাদরে পত্নীকে বল্লেন,—"অয়ি কুসুম-কোমলা আত্রেয়ি! এতদিন সংসারে ভোগলালসার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রেখে প্রবৃত্তির আরাধনা ক'ল্লেম, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা, অন্তরের মোহময় আবেগ, ভালবাসার সুখ-স্বপ্নময়ী জীবন্তশক্তি দিয়ে যে লতাটিকে মুঞ্জরিত রেখে, হেসে খেলে, জীবনের সমস্ত দিনমান কাটিয়ে দিলেম্, কিন্তু কৈ প্রবৃত্তিকে ত তৃপ্ত কর্ত্তে পাল্লেম্ না, কামনার ত শেষ হ'ল না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে॥"

বরং যেন কামনার অগ্নি উপভোগের ঘৃতক্ষেপণে আরও প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্লো। কৈশোরের স্মৃতি, যৌবনের মোহ, হৃদয়ের উচ্ছ্বলিত ভালবাসায় সংসারকে এতদিন সুখময়-স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিকানন ব'লে ভেবে ছিলেম, কিন্তু কৈ প্রকৃত আপনার কাজ কি হ'ল আত্রেয়ি?

ঐ শুন, মার মত সস্নেহ ভাষায় শ্রুতি বল্‌চেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তুমি যদি বাসনার লীলাস্থল, যৌবনের সুখকানন, বার্দ্ধক্যের স্বর্ণযষ্টি, এই চিরপরিচিত সংসার, গ্রাম, গৃহ,

আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটা'তে পার, তবে চল যাই, পৃথিবীর উর্দ্ধে, স্বর্গের পারে, আকাশের উৎপত্তি ক্ষেত্রে, যে স্থানে অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই; সেই আনন্দধামের উদ্দেশে এস চলে যাই।

"ন চ কর্ম্মণা সংভিন্নং ন চ গ্রস্তং জরাদিভিঃ।"

আত্রেয়ী। স্বামিন্! আমার আবার স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? যেখানে তপন, রশ্মি সেখানে; যে স্থানে পুরুষ, প্রকৃতিও সেই স্থলে; দ্রব্য ত্যাগ করে গুণ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—"এতদিন ধ'রে যে বেদ পাঠ কল্লেন, আজীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়ে এলেন, প্রাণ দিয়ে দেবতার উপাসনা, সংসারের কঠিন কর্ত্তব্যপালন ক'রে এলেন, তাতে কি প্রকৃত আপনার কাজ হয় নি?"

সনন্দ। এতদিন পূজার ঘণ্টা বাজিয়ে এসেছি, এখন পূজা ক'র্ত্তে হবে; পুস্তকের ভূমিকা লেখা শেষ হয়েছে, এখনও পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়নি; যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও পূর্ণাহুতি বাকি।

"নায় মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

আরও কি করেছি জান? অজ্ঞান হ'তে মুক্ত হবার জন্য অজ্ঞানের আরাধনা ক'রে অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝ্‌তে পেরেছি। আর জেনেছি, প্রবৃত্তিতে শান্তি নাই, শান্তি শুধু নিবৃত্তিতে।

সনন্দ। অবশ্য একটু প্রভেদ আছে "জ্ঞানী আমারই আত্মা জানিও।" "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" আর ভক্ত আমার প্রিয়। "ভক্তোমেহতীব প্রিয়ঃ" এই দুই ভগবদ্ভক্তি দ্বারায় বুঝা যায়। তবে এ প্রভেদ উপায়ের বিভিন্নতা বোধ করায় মাত্র। বুদ্বুদ্ সাগর হইতে আপনাকে পৃথক বোধ করুক বা নাই করুক, সাগরে গেলেই তার সহিত মিশে ও আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলে; ভক্তও তেমনি ভগবানে আপনার অস্তিত্বটুকু মিশিয়ে দেয়। জ্ঞানী ভগবানের সহিত অভিন্ন ভেবেই থাকে, কিন্তু এই অভিন্নতার প্রতিবন্ধক কাটাতে চেষ্টা ক'রে এলে দুই এক।

আত্রেয়ী। আমাকে এই দুইটি উপায়ের কোনটি নিতে বল।

সনন্দ। ভক্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পথ বিনা অন্য পথ নেবার অধিকার নেই।

আত্রেয়ী। তবে চল প্রভু, দু-জনে একসঙ্গে পরমধাম উদ্দেশে চ'লে যাই। আজ কি পুণ্যদিন। আমার আজ দীক্ষা হ'ল, স্বামীসেবার সার্থক হ'ল।

নমস্তেঽহং পতিরূপী মহাত্মন্।

"ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার,
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটী যাহার।"

আত্রেয়ী। জ্ঞানী বা ভক্ত, এই উভয়ের প্রকৃতি ত ভিন্ন। জ্ঞানী সুখ দুঃখ বিমুক্ত, জগতের দুঃখে অভিভূত হয়েন না। ভক্ত প্রেমময়, জগতের দুঃখে সদা দুঃখী।

সনন্দ। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ ॥"

প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত ভক্তে কিছুই বিভিন্নতা নাই। প্রথম স্তরে সনক, সনাতন, নারদ, গোপীকাদির নাম পাওয়া যায়। ভাগবত কি বল্‌ছেন দেখ :—

ছায়া প্রত্যাহ্বয়া ভাসা হ্যসন্তোপ্যর্থকারিণো।
এবং দেহাদিয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা মৃত্যুতাভয়ং ॥

১১ স্কন্দ :৮শ অধ্যায়।

"মিথ্যা দেখ প্রতিবিম্বে সত্য ভ্রম হয়।
সত্য সম প্রতিধ্বনি যেমত শুনয় ॥
শুক্তিকায় রৌপ্যজ্ঞান যে প্রকারে হয়।
মরীচিকা আদি যেন জল সে বুঝয় ॥
এরূপ শরীর আদি যত ভাব হয়।
মরণ অবধি ভ্রম কভু না ঘুচয় ॥
জ্ঞান হলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে।
আর তার মৃত্যু ব'লে ভয় নাহি থাকে ॥"

আত্রেয়ী। তবে কি জ্ঞানীই ভক্ত, ভক্তই জ্ঞানী।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

এই নিরাকার সাকার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা পুস্তকভারবাহিনী বিদ্যার আয়ত্তে নাই, বুদ্ধির আয়ত্তে ইহার মীমাংসা হয় না। এই স্বরূপতত্ত্ব না বুঝ্‌তে পেরে, নিরাকারবাদী সাকারবাদী পৃথক হ'য়ে পড়েছে।

সনন্দ। বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভারত, ভাগবৎ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, সকল শাস্ত্র সাকারে আরম্ভ, নিরাকারে পরিণতি। প্রহ্লাদের সাকার ভক্তির প্রতি-অবয়বে নিরাকারের ছবি পরিস্ফুট। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে সারভূত পাঠ পড়্‌তে বল্লেন, প্রহ্লাদ পড়্‌লেন :—

"অনাদি মধ্যান্তমজমবৃদ্ধি ক্ষয়মচ্যুতং"

স্তব কর্‌লেন :—

"রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সূক্ষ্মাণি চ ভূতভেদা
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব বিশ্বং॥"

আবার জ্ঞানী বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর হৃদয় পানে তাকাও, দেখ্‌বে ভক্তির বিমলধারা কি সুন্দরভাবে ক্ষরিত হচ্চে,—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।" দার্শনিকজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের শিব স্তোত্র ত পড়েছ, সে স্তোত্রে কি ভক্তি উচ্ছ্বলিত না হ'য়েছে।

আত্রেয়ী। সাকার চিন্তা করা যায়, নিরাকার কি চিন্তা করা যায়?

সনন্দ। সাকারের মধ্য দিয়ে নিরাকারের চিন্তা ক'র্ত্তে হয়। প্রকৃতির সযত্ন রচিত দৃশ্যপটের মধ্যে, তাঁর মহিমা চিন্তা ক'র্ত্তে হয়; যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, বৃত্তিগুলির আকার নাই, কিন্তু কার্য্যের মধ্য দিয়ে তাদের অভিব্যক্তি দেখে চিন্তা ক'র্ত্তে হয়। তবে এমন কেহ নিরাকার উপাসক জন্মে নাই, যিনি সাকার মিথ্যা বল্‌তে পারেন। তাঁরই সৃষ্ট উদ্যানের পুষ্প দিয়ে, তাঁরই নির্ম্মিত মৃত্তিকা দিয়ে, তাঁরই কল্পিত নাম ধ'রে তাঁর উপাসনা করা যায় না ব'লে যদি কারো ভ্রান্তি থাকে (জানি না আছে কি না?) তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি কি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি দিয়ে কখন উপাসনা ক'রে থাকেন? তিনি কি নিজসৃষ্ট উপাদানে নিজস্ব চিন্তাদ্বারা উপাসনা ক'র্ত্তে পারেন?

আমাদের কি আছে যে, তাঁকে দিয়ে সন্তুষ্ট ক'র্ত্তে পারি? ভক্তি, সেও তাঁর, আর পুষ্প, বিল্বদল, চন্দন-চর্চ্চিত ক'রে তাঁকে অর্পণ করাও তাঁরই জিনিষ তাঁকেই দেওয়া ভিন্ন আর কি? আকাশ, মেঘ, তপন, শশাঙ্ক, গ্রহ, তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, বায়ু, সলিল, ইহাদের মধ্যে তাঁর যেমন ছবি দেখতে পাওয়া যায়, স্বহস্ত রচিত মূর্ত্তি মধ্যেও কি সে ছবি নাই? সবই তাঁর কার্য্য, সবই ত ফটো, তবে ইতর বিশেষ কি? গীতায় ভগবান ব'লে দিয়েছেন:—

তিনিও সাকার তত্ত্ব কিছুই বোঝেন নাই। আবার যিনি বলেন আমি বেশ বুঝিয়াছি, তিনি আংশিক বুঝিয়াছেন মাত্র।

"যন্মান্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।"

পরমভক্ত প্রহ্লাদ ইহার বেশ মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন;

"ন কেবলং মে হৃদয়ং স বিষ্ণু
রাক্রম্য লোকানখিলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্
সমস্ত চেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ

যে নিরাকার ধ্যান করে, সে নিরাকারের বিভূতিই ধ্যান করে। আকাশের স্বচ্ছতা, মেঘ বিচ্ছুরিত তপনকিরণ, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাই চিন্তা করে, সে কি সাকারবাদী নহে? যে সাকার উপাসনা করে, মনোমত মূর্ত্তি গড়ে, তাঁর চরণে কুসুম দিয়া পূজা করে; সে কি জানে না, ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতেই ইঁহার বাস। তবে এইটি বিশ্বাস ক'রে, তিনি সকল আকারেই দেখা দিতে পারেন। তবে সাকারবাদী কি নিরাকারের উপাসনা করিল না? ভগবানই ব'লে দিয়েছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

মনোময়, প্রাণশরীর, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় যিনি, তিনি যে আকার ধারণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন, তা যদি নাই পার্ব্বেন, তবে তাঁর শক্তির সীমানির্দ্দেশ হ'ল না কি? তিনি নীরূপ—কিন্তু জগত যে তাঁর রূপ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে দেখ, বায়ুর সবেগ চলনে দেখ, তিনি আছেন; স্বচ্ছ আকাশের গাত্রে তাঁর পবিত্রতা, তপন কিরণে তাঁর জ্যোতিঃ; পরমাণু মিশ্রণে তাঁর শক্তি। তিনি সত্তাহীন জগতকে সত্তা দিয়ে, জড়কে চৈতন্য দিয়ে, প্রাণহীনকে বিদ্যুৎ দিয়ে সজীব ক'রে রেখেছেন। তবে আবার তাঁর আকার নাই কৈ? রূপ নাই কৈ? যে নিরাকার ভেবে সাকারের পুজা করে, সেও নিরাকারই ভাবে।

আত্রেয়ী। এ কেমন কথা হ'ল প্রভু।

সনন্দ। যে উপনিষৎ নিরাকার উপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনিই ত বল্‌ছেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।

যে ভাগবৎ সাকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই ত বলেছেন:—

আসীজ্‌ জ্ঞানময়োহর্থ একমেবা বিকল্পিতং॥

যে নিরাকারবাদী বলেন, সাকার মিথ্যা," তিনি নিরাকারের কিছুই বোঝেন না। আবার যিনি সাকারবাদী, নিরাকার উপাসনাই হয় না বলেন,

আত্রেয়ী। তবে এ অচিন্ত্য অননুভাব্য তত্ত্ব জান্‌বার আশা পোষণ করেন কেন? এ বৃথা চেষ্টার ফল কি?

সনন্দ। আমরা অজ্ঞান, ভক্তিহীন। আমাদের কাছে অচিন্ত্য ব'লে কি সকল সময়েই অচিন্ত্য? পদ্মের নালদণ্ড দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা যায় না ব'লে কি বৃক্ষ অচ্ছেদ্য? যদি অনুভবের আকারে তাঁকে না পাওয়া যেত, তবে তিনি লীলাময়, ভক্তবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান্ কেন? তিনি অজ্ঞানীর কাছে অনন্ত যোজন দূরে, কিন্তু জ্ঞানীর কাছে করতলধৃত আমলকীর মত; ভক্তের কাছে নয়নের সাম্‌নে অবস্থিত।

তদেজতি তন্নৈজতে তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্যসর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

আত্রেয়ী। তাঁকে জানবার উপায় কি?

সনন্দ। ভক্তি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে" ভক্তির টানে তাঁকে নেমে আস্‌তে হয়। পুত্রের "মা মা" রোদনে যেমন মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠে, তেমনি ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আকুল আহ্বানে তাঁর আসন কেঁপে উঠে।

আত্রেয়ী। নির্গুণ, নিরাকার বল্‌ছেন, অথচ আবার তাঁর আসন কেঁপে উঠে, এ কেমন কথা প্রভু।

সনন্দ। সর্ব্বশক্তিমান্ মহামায়াবীর পক্ষে আশ্চর্য্য কি?

"ব্রহ্মণা সৃজতে বিশ্বং বিষ্ণুনা পালয়েৎ মহীং।
রুদ্রেণ সংহরেদ্ যো হি তস্য শক্তেঃ সীমা কুতঃ॥

আত্রেয়ী। অজ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝ্‌লেন?

সনন্দ। বুঝেছি,—যা আপনার ভেবে এতদিন সুখে, দুঃখে, মোহে, জড়তায় আচ্ছন্ন ছিলেম, সে কেবল বাসনার বিভিন্ন বিকাশ, বুদ্ধির অলীক অভিমান মাত্র। এতদিন মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা কাটিয়ে এসেছি, এখন জান্‌তে হবে, যাহা সত্য "নিত্যো নিত্যানাং-শ্চেতনশ্চেতনানাং।" পেতে হবে; সেই বাহ্য জ্যোতির প্রকাশক স্বয়ম্প্রকাশ, তখনই এই সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্ম অন্ধকারের মত বিলীন হ'য়ে যাবে।

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

আত্রেয়ী। সে সত্য কিরূপ তাহা বুঝিয়ে দিন।

সনন্দ। তা যে কি? এখনও শ্রুতি বুঝাতে পারেনি, পুরাণ রূপকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে। ভাষার যদি জীবন থাক্‌ত, কল্পনার যদি চক্ষু থাকত, ভাবের যদি প্রাণ থাক্‌ত, তবে বুঝাতে চেষ্টা ক'র্ত্তে পার্ত্তেম্‌। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যার সীমা ধর্ত্তে পারে নি, বাক্য মনের সহিত যে স্থান হ'তে ফিরে আসে;

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

তাঁর স্বরূপ কি বোঝাব। তবে ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণে জীবাত্মায়, আর সকলগুলি যদি এক শান্ত পরমাত্মায় মিশিয়ে দেতে পার্ত্তি, তা হ'লে বোধ হয়, তাঁকে বুঝ্‌তে পারা যেত। "বিদিতাদধি অবিদিতাদধি" (অধি উপরি ভিন্নার্থক)।

মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী।

(১)

বাণভট্টবিরচিত কাদম্বরী নামক গদ্য কাব্যের নাম না জানেন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে বোধ হয় একজনও নাই। তাঁহার অপ্সরার নূপুর শিঞ্জিতের ন্যায় লীলাবতী প্রাণময়ী ভাষা, কল্পনা এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহাকে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে। রসময়ী মানব রসনা "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ" বলিয়া আজিও সেই অতীত-গর্ভশায়ী প্রতিভাবান্ মহাকবিকে, বিশ্বজয়ী সম্রাটের স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে পূজা করিতেছে! বাণভট্ট—কবি, শুধু কবি কেন? বাণভট্ট রসিক প্রেমিক ভাবুক কবি। "কাদম্বরী" তাঁহার গৌরবের মর্ম্ম মন্দির।

আজ যে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বাঙ্গালার আদর্শ, ভারতের গৌরব, বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, সে ভাষা কাদম্বরীর ছায়ালোক সম্পাতে সমুজ্জ্বল। কমলাকান্তের দুর্গোৎসব পড়িলে প্রতিমুহূর্ত্তে কাদম্বরীর ভাষার সে অতুলনীয় এস্রাজ্ ঝঙ্কার মনে পড়ে! ঘটনার উন্মাদিনী মহিমায়, কল্পনার মুগ্ধকারিতায়, কবিত্বের শুভ্রোজ্জ্বল মোহময়ী অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় বাণভট্টের কাব্য সাহিত্যাকাশের অনাবিল উজ্জ্বল দ্যুতিমান্ পূর্ণ শশধর; সেই নভোনিকুঞ্জ-সুধাধার

সুধাকর হইতে—যে দুইটি জীবন্তরশ্মি বাহির হইয়াছে, তাহার একটির নাম মহাশ্বেতা, অপরটির নাম কাদম্বরী। যেন আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনী বিধাতার নির্ম্মাল্যস্পর্শে দ্বিধারায় বিভক্ত হইয়া রঙ্গে ভঙ্গে, তরঙ্গে, নাচিতে নাচিতে চির যৌবনের মধুস্বপ্নের প্রাত-বিম্ব বুকে ধরিয়া সহসা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। দুইটি চিত্র পাশাপাশি দাঁড় করাইলে মনে হয় ইহার একটি বুঝি প্রেম ও অপরটি মূর্ত্তিমতী ভোগলিপ্সা! মহাশ্বেতা—ঋষি সেবিতা মন্ত্রোচ্চারণ পূতা শ্যামচ্ছায়া ভূষিতা তপোভূমি, কাদম্বরী—লতা বিতান-শোভনা সযত্ন রচিতা মনোরম পুষ্প বাটিকা।

মহাশ্বেতার সেই কুন্দেন্দু ধবল তনুপ্রভা, শুভ্রবর্ণ, দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন চাহনি, আর সেই শান্তোজ্জ্বল মধুর অনুভাব দেখিলে মনে হয় যেন নিবৃত্তির শান্তিসুখকর আশ্রমে আসিলাম; মহাশ্বেতার প্রতি পাদক্ষেপে বৈরাগ্যের অনুদ্বেজক কোমল সঙ্গীত বাজিতে থাকে; তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবে যেন অহেতুকীভক্তির বিশ্ব বিকাশিনী মধুর মূর্ত্তি প্রতিফলিত। আশ্রমের অধিদেবতা আশ্রমেই থাকে; তাই মহাশ্বেতা রাজসংসারের কোলাহলময় গৃহে পদস্পর্শ করেন নাই। কামনার রাজ্যে মহাশ্বেতা—যেন সাক্ষাৎ নিষ্কাম! কবি সর্ব্বদর্শী, সূক্ষ্ম বিচারক, তাই মহাশ্বেতাকে ঋষি সেবিকা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, শান্তিরাজ্যের সাম্রাজ্ঞী এবং পুণ্যচারিণী পার্থিব শ্রী করিয়া গঠন করিয়াছেন, অন্যত্র কাদম্বরীর সেই বালতপন বিপুর গৌরবর্ণ, সাবলাস বঙ্কিম দৃষ্টি, সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী, দেখিলে মনে হয়—বুঝি কোন কামনাময়ী, ভোগময়ী প্রকৃতি

মানবকে স্বর্গরাজ্যে পৌছিয়া দিবার জন্য—রূপের বজার খুলিয়া বসিয়াছে। যেখানে কাদম্বরীর আবির্ভাব—সেই স্থান অপ্সরার প্রেমপূর্ণ সঙ্গীতরবে মুখরিত! সেখানে বাসনার ঘৃতক্ষেপে প্রবৃত্তি হুতাশন লেলীহান্ শতশিখায় ধক্‌ধক্ জ্বলিয়া উঠে! চিত্ররথ দুহিতা কাদম্বরী বিচিত্র বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া শুকধ্বান মুখর কুঞ্জগৃহে বসিয়া কখন বীণাধ্বনি শোনেন, কখনো বা কমল হাসিনী স্বচ্ছ সরসীর বুকে স্বপ্নালস সমীরণের ক্রীড়া দেখিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের আশারাগের প্রতি চাহিয়া থাকেন। কাদম্বরী যে দিক দিয়া চলিয়া যান, সেই—রক্তোৎপল বিকাশী চরণস্পর্শে সে স্থানের জড় মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে, অঞ্চল তাড়িত প্রেমলুব্ধ পবন আকুল হইয়া তরুণীর চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়ে; যুবজনের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত কাদম্বরীর যথেচ্ছ নিক্ষিপ্ত চাহনির আশায় ক্ষীণকণ্ঠ তৃষিত চাতকের ন্যায় বিহ্বল ভাবে অপেক্ষা করে। কাদম্বরী রাজান্তঃপুরবাসিনী তাই রাজগৃহের চতুরতায় তিনি শিক্ষিতা, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় লালক্ষিতা, সখীমুখে প্রেমমন্ত্র শ্রবণেই তিনি আজীবন দীক্ষিতা। সুখস্বপ্নময়ী বিলাসের সুকোমল শয্যায় শয়ানা প্রগল্‌ভা সখীদের রহস্যালাপে আবাল্য-অভ্যস্তা কাদম্বরী, তাই এত চতুরা, এত বুদ্ধিমতী। তাঁহার বাসভবন দেখিলে—দেবভোগ্য অমরাবতী মনে পড়ে। তথায় কত রূপসী রূপেরই ডালা সাজাইয়া অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিয়া থাকে, কত কসিত-কনক-কান্তি বিলাসিনী স্থিরপ্রভ বিদ্যুল্লতার মত সে স্থানে বেড়াইয়া বেড়ায়। মন্দানিল বীজিত কুসুমিত উপবনে

সখী সহ ভ্রমণ, লতা বেষ্টিত কুঞ্জবনে রাত্রিবাস, সুরভি কুঙ্কুমময় সরসীমধ্যে অবগাহন, কাদম্বরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার্থক সাধনা। অন্তঃপুর বাসিনীদের পরস্পর মান অভিমানে, নায়কাকাঙ্ক্ষিত রসালাপে, রক্তকুঙ্কুম ক্ষেপনে, কাদম্বরীর সুধাধবলকক্ষে - নাজানি কোন অদৃশ্য রসিক শিল্পী কত ইন্দ্রজালই রচনা করিয়াছেন। কৈশোরের সচপল আবেগ. যৌবনের উদ্দাম মোহ, নন্দনের অম্লান সুষমা দিয়া কাদম্বরীকে গড়া হইয়াছিল বলিয়াই কাদম্বরী এত মনোহারিণী! এত মদিরাময়ী। কাদম্বরী কবির অপূর্ব্ব নায়িকা, রাজরাজেশ্বরেরও বাঞ্ছিতা! কাদম্বরী চন্দ্রপীড়ের অনুরাগিণী।

"যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ।"

(২)

মহাশ্বেতা।

পৃথিবীর পুণ্য প্রথিত ব্রাহ্মণ্যের দৃপ্ত তেজোময়, মাধুর্য্যের স্ফুটন্ত গৌরব, পুণ্ডরীক যখন মহাশ্বেতার, নয়ন পথে পতিত হইলেন, তখনি—সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে—হংসরাজ দুহিতা আনাঘ্রাত ফুল্ল ফুল সুষমাময়ী মহাশ্বেতা আপনার প্রাণ মন—সেই ঋষি কুমারের রাজীবফুল্ল চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। সহসা, পুণ্ডরীকের অজ্ঞাতে, সেই বিভোর কটাক্ষশালিনী তরুণীর—অনুচ্ছিষ্ট পবিত্র সত্তা সেই নিতান্ত অপরিচিত পুণ্ডরীকের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে শোণিতে - রক্তশোণিকার মত মিশিয়া গেল। প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—দুইটি প্রাণে এক অক্ষয় গ্রন্থি-বন্ধন বাঁধিয়া দিলেন।

তখন আকুল প্রাণে সেই কুলকামিনী, তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ প্রেম প্রবণ হৃদয়—দুইহস্তে দৃঢ় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত চরণে আপনার গৃহাভিমুখে চলিয়া আসিল! কিন্তু গমনকালে যুবতীর লাক্ষারসরাগ লোহিত চরণদ্বয়, প্রিয়দর্শন পুণ্যতীর্থ ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা বশতঃ মঞ্জীর স্বনে "না না" করিয়া বারণ করিতেছিল! আর পথিপার্শ্বোত্থিত—লতা-বধূরাও শাখাহিল্লোলে জড়াইয়া ধরিয়া রমণীর গৃহ গমনে বাধা জন্মাইতেছিল।

হায় প্রেম প্রতিমা—মহাশ্বেতা! আজ তুমি একি করিলে? দৃঢ় সংযম দেখাইতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রাত্মা ঋষিতনয় পুণ্ডরীককেও বিসর্জন দিয়া আসিলে! তোমারই তরে মরণ শয্যায় শয়ান পুণ্ডরীকের জীবন বাঁচাইবার জন্য কপিঞ্জল যখন তোমার নিকটে গেল, প্রিয় সুহৃদের সে মর্ম্মভেদী অবস্থার কথা বলিয়া তোমার মুখে আশাপ্রদ উত্তর শুনিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিল, সে সময়েও প্রেম দেবতার আদেশের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া—তুমি কি এইরূপে কুলকামিনীর ইন্দ্রিয়জয়িনী ধীরতার পরিচয় দিলে! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! তুমি প্রেমিকা, কিন্তু আদর্শ নায়িকা। তোমার রমণী হৃদয়ে উত্থান পতনের সঙ্গে কঠোর ধৈর্য্যের কি মহান্—দৃপ্ত তেজ! এরূপ চিত্তের দৃঢ়তা বালিকায় কখন সম্ভবে না, তাই কুমারীদের স্বয়ং স্বামী নির্ব্বাচন প্রথা সংযমপূত বরেণ্য ভারতে আজ নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রেমিকের অনন্তরূপে—দু'নয়ন আলোক পূর্ণ হইলে, প্রণয়িনী আপনার

অদম্য হৃদয়বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া, আত্মহারা হইয়া—সাগরাভিমুখী তটিনীর ন্যায়—প্রণয়ী সকাশে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সে উপাদানে বিধাতা মহাশ্বেতাকে সৃষ্টি করেন নাই; মহাশ্বেতার হৃদয় উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় কোমল নহে। পুণ্ডরীকের বিরহদশা শুনিয়া মহাশ্বেতা ভাবিল, "আমার সুখ, আমার লজ্জা, আমার মৃত্যু, এমন কি আমার অপবাদের চেয়েও ঋষিকুমারের প্রাণ অনেক মূল্যবান।" তাই মহাশ্বেতা অসঙ্কোচে চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত মুক্ত আকাশতলে মৃত্যু শয্যাশায়ী পুণ্ডরীককে দেখিতে গেল। আপনার স্বার্থপর হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য বা নিজের প্রেম পিপাসা মিটাইবার জন্য মহাশ্বেতা ব্যাকুল নহে। শঙ্কিত মনে, কম্পিত চরণে, মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের শেষ দশা দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল,—তাহারই জন্য সেই উদীয়মান তপনের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বলপ্রভ ঋষিকুমার জীবনের তেজোময় মধ্যাহ্নে, বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়ে মনোজ রাহুর সর্ব্বগ্রাসী আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিয়া, মর্ত্ত্যের কঠিন মাটীর উপর—মৃত্যুশয্যায় শায়িত; বক্ষের উপর নলিনীদল অযথা বিক্ষিপ্ত, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের অনুলেপন—শিথিল ও ম্লান, মহাশ্বেতার পদধ্বনি শুনিবার আশায় যেন তাহার নিস্তব্ধ ইন্দ্রিয় তখনও শেষ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই। তখনও সেই নিস্পন্দ কনকলেবর—প্রেম প্রতিমার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শসুখ লালসায়, শমনের কঠোর আহ্বান শুনিতে পাইয়াও,—অতৃপ্ত প্রাণকে জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল। সেই অবস্থায় পুণ্ডরীককে দেখিয়া ছিন্নমূল লতিকার মত মহাশ্বেতা

তরলিকার গাত্রে ঢলিয়া পড়িল, প্রবল ঝঞ্ঝায় আহত হইয়া, শিথিল বৃন্ত শিরীষ কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল, সে অসহনীয় অপ্রত্যাশিত শোকের উত্তাপে মহাশ্বেতার বুভুক্ষিত ক্ষুদ্র বুকখানি একেবারেই দগ্ধ হইয়া গেল! বালিকার প্রাণচিহ্ন কেবল ক্ষীণ নিশ্বাসের ছলে—পঞ্জরতটে মৃদু আঘাত করিতে লাগিল।

মহাশ্বেতা সহমরণে চিত্তস্থির করিলে মহাপুরুষ নির্দ্দেশানুসারে কেবল পুণ্ডরীক বাঁচিয়া উঠিবেন এই আশালোকের ক্ষীণরশ্মি তাহাকে মরিতে দিল না। সেই আশারশ্মিই, তাহার জড়দেহে তাড়িত প্রবাহে—চেতনা সঞ্চার করিয়া দিল। মহাশ্বেতা উঠিয়া বসিল।

মহাশ্বেতা নিজহস্তে সেই ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণকুন্তলে জটা রচনা করিল! আর্দ্র বল্কলে যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী লুকাইয়া, তপস্বিনী সাজিল, বিরাগের দীর্ঘ শ্বাসে অধররাগ শুখাইয়া গেল! মহাশ্বেতা যৌবনে যোগিনী হইয়া, পুণ্ডরীকের পুনর্মিলন আশায় তাহারই রূপ ধ্যান করিতে লাগিল।

হায় পুণ্ডরীক! মায়াবী মদনের অনেক প্রকার ইন্দ্রজাল বিস্তার জগতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এরূপভাবে জীবন বিসর্জ্জন, নূতন। অবাধ্য হৃদয়ের সহিত এতটা যুদ্ধ কেহ কখনও করে নাই বলিয়াই কি তুমি অবসন্ন হৃদয়ে—পঞ্চশরের প্রভাবে পঞ্চভূতে আপনার সমস্ত শক্তি মিশাইয়া ফেলিলে! যে প্রতাপ, যোগীশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে, বিচালিত করিয়াছিল, তরুণবয়সে তাহা কি তুমি সহিতে পার? তোমার নবীন জীবনে মদনের অত্যাচার—মর্ম্মস্থানগত বিষক্ষতের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল!

(৩)

মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা পিতা মাতার সকরুণ অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া মানব সমাগম বিরহিত বিজন অরণ্যে শিব আরাধনায় মনোনিবেশ করিল! সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া সুষমার কোলে বৈরাগ্যের মত তমালিকা সহ সেই বন আলো করিয়া ফল মূল আহারে সময় কাটাইতে লাগিল, মহাশ্বেতা শিব পদতলে করুণ নিষ্কাম মূর্ত্তি, মহাশ্বেতা একাকিনী পরলোকগত পুণ্ডরীকের জীবন আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচারিণীর বেশে "নিয়মক্ষামমুখী" হইয়া কালপাত করিতে লাগিল।

হায় সেই তরুণী প্রেম প্রতিমা, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী বেশে— প্রখর শোকবেগে নিরাশাদগ্ধ বুকখানি চাপিয়া রাখিয়া কম্পিত করে বীণাটী ধরিয়া ঝঙ্কার দিত। কখনো বা প্রকৃতির উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তরে দূর আকাশের দিকে চাহিয়া সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনায় সঙ্গীত গাহিত। তেমন শোকবেগ, তেমন অদম্য বিরহাগ্নি কোন মতে শান্ত রাখিয়া কঠিন কর্ত্তব্য পালন আর কোন্ রমণী করিতে পারিয়াছে? অধর প্রান্তে কর্ত্তব্যের চিহ্নস্বরূপ মলিন হাসি অঙ্কিত করিয়া কেমন স্থিরভাবে চন্দ্রাপীড়ের আতিথেয়তায় মন দিল। কেমন সমবেদনা পূর্ণ মৃদুভাষায় প্রাণপ্রিয়তমা সখী কাদম্বরীর সুখ দুঃখের ভাবনা ভাবিল। আবার যখন পুণ্ডরীক বৈশম্পায়ন জন্মে মহাশ্বেতাকে দেখিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া সকাতরে তাহার

প্রেমভিক্ষা চাহিয়াছিল, তখন মহাশ্বেতা পতিদেবতার প্রতিচ্ছবি কামপীড়িত বৈশম্পায়নকে হেলায় প্রত্যাখ্যান করিল, সে ভালবাসার স্মৃতি বৈশম্পায়নের হৃদয়ে শিরায় শিরায় তড়িত প্রবাহ বহাইয়া দিল কিন্তু মহাশ্বেতাকে একটুও বিচলিত করা দূরে থাক,—সতীত্ব মহিমাদীপ্ত অন্তর্নিরুদ্ধ তেজ আরও বাড়াইয়া দিয়া গেল, ফলে মহাশ্বেতার শাপে বৈশম্পায়নের কামপীড়িত অপবিত্র দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল, নিবৃত্তির নিকট প্রবৃত্তির পরাজয় ঘটিল।

(৪)

কাদম্বরী।

রাজান্তঃপুরে কাদম্বরীকে যখন সখী পরিবেষ্টিতা দেখিতে পাই তখনই তাহার যৌবন সুলভ চাতুরী, লজ্জা বিজড়িত অঙ্গভঙ্গী বাক্য বিন্যাসের পরিচয় পাই, তাহার সেই বিলাস চঞ্চল দৃষ্টি দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি দেবী সম্মুখে আসীনা, উদ্যান পালিকার প্রতি কাদম্বরীর সে সস্মিত পল্লব নিক্ষেপে, সখীগণ সহ সে প্রীতিবিশ্রম্ভ রহস্যালাপে, চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অভ্যর্থনায় তাহার চরিত্রের সমস্ত ভাগটাই বেশ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তাম্বুল প্রদানের জন্য সাত্বিকভাব কম্পিত সরম জড়িত হাত খানি, কাদম্বরী যখন বাড়াইয়া দেন, সেই প্রসারিত হস্তের উদ্ভিন্ন রোমাঞ্চ লক্ষ্য করিলে বেশ বোধ হয় যেন, প্রণয়ের নবীন রক্তিম রাগ সমুজ্জ্বল গৌর তনুকে, আরও উন্মাদক,

আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। কাদম্বরীর প্রণয়ে মোহ, আলাপে চাতুরী, ব্যবহারে নায়িকাসুলভ সবিভ্রম লজ্জা দেখিলে পাশ্চাত্য কবির যৌবনোদ্দীপ্তা বিলাসিনী রমণীর কথা মনে পড়ে। এই চরিত্রে কুমারীর সংযমের দৃঢ়তা ছিল না, প্রণয়ের উদ্দামতার ভিতর ধীরতার সামান্য স্পন্দনও অনুভূত হইত না; মদনিকা, পত্রলেখা শুক সারিকা সংবাদে কাদম্বরী চরিত্র সমুজ্জ্বল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আর্য্যনারীর মহিমাময় সতীত্বোদ্দীপ্ত তেজ দেখিতে পাই না, বিশালকায়া পদ্মা যেন আপনার অগাধ জলরাশি বক্ষে ধরিয়া কলকল-নাদে বহিয়া যাইতেছে।

কবি এমন উন্মাদকতায় কাদম্বরীর প্রণয়রাগ এরূপভাবে ফেনাইয়া ফেনাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—ভোগের উলঙ্গমূর্ত্তি এমন মোহকর তুলিতে আঁকিয়া দিয়াছেন যে দেখিতে দেখিতে আমাদের আঁখি অবসন্ন হয়। আর্য্যরমণীর সংযত পবিত্র প্রণয়ের নব নির্ঝরিণীর কুল কুল নাদ শুনিয়া, সে কুল প্লাবিনী বিশাল তরঙ্গা গিরি নির্ঝরিণীর স্ফীত প্রবাহ আর ভাল লাগে না।

যে সময়ে মহাশ্বেতা-মুখে প্রিয়বন্ধু বৈশম্পায়নের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রাপীড় শাপের অলঙ্ঘনীয়তার জন্য কাদম্বরী—দর্শন-লালসাকুল-প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তাহার পরে প্রেম সহায় অভিমানকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত সিন্ধুর মত পুলকপূর্ণ প্রাণ লইয়া কাদম্বরী সেই স্থানে আসিলেন, চন্দ্রাপীড়কে তদবস্থ দেখিয়া জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ, সুখ সৌন্দর্য্যময়ী ধরা মরুভূমির মত কঠোরদর্শন বোধ হইতে লাগিল। নিরাশার প্রখর করস্পর্শে

কাদম্বরীর কামনাময় আশা রাগরঞ্জিত ইন্দ্রধনু মুহূর্ত্তে জন্মের মত মুছিয়া গেল। নব যুবতীর বুভুক্ষিত হৃদয়—অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কবি, সংযমপূত ভারতের কবি, এই সময়েই তাই কাদম্বরী চরিত্রে আর্য্যরমণীর ছবি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভোগের জলদরাশির মধ্যে নিষ্কামের মৃদুবিজলি এই খানেই চমকিত হইয়া উঠে। "মৃতপতি বাঁচিবে" এই সঞ্জীবন মন্ত্রে মৃতপ্রায়া কাদম্বরী ভবিষ্যৎ আশায় বুক বাঁধিয়া জীবিত রহিলেন। তাঁহার উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের রঙ্গভূমি,—যাহা আলোক মালায় সমুজ্জল ছিল—তাহা যেন মুহূর্ত্তে শ্মশানের গাঢ় অন্ধকারে ও নীরবতায় ভীষণ ভাব ধারণ করিল। মদন ভস্ম হইলে রতি যেমন পতির জীবন লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়াছিল, কাদম্বরীও তাহাই করিলেন; অলঙ্কার বেশ-ভূষা পরিহার করিয়া দীনা ভিখারিনী সাজিলেন। প্রবৃত্তির কুলপ্লাবী প্রবাহ মধ্যে নিবৃত্তির মৃদু প্রবাহ আসিয়া পড়িল। কামনার মধ্যে নিষ্কামের ছায়া যেন ফুটিয়া উঠিল।

শ্বশুর শাশুড়ীর পাশে লজ্জাবতী লতার মত ম্রিয়মানা কাদম্বরীকে দেখিলে মনে হয় আর্য্যগৃহে নববধূর মত সে সলজ্জ ভাব, সে সসঙ্কোচ ব্যবহার, ভারত কামিনীর অপরিহার্য্য লক্ষণ. ভারত ললনা যতই কেন পাশ্চাত্য আবরণে আবরিত হউক না, যে ভারত ললনা- সেই ভারত ললনাই থাকিবে।

(৫)

উপসংহার।

পরিশেষে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরী, পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার মিলন ঘটে। এই মিলনে, ৪টী অতৃপ্ত প্রাণের কি মহান পরিতৃপ্তিই দেখিতে পাই! কবি যেন বিশ্বের প্রেমকে মন্দারের মধু মাখাইয়া অনাবিল সৌন্দর্য্যের বিগলিত তরল জ্যোৎস্নায় ছানিয়া,—এই দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগানন্দ নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মিলনানন্দে, এই অপূর্ব্ব প্রেম মহিমায়, এই অবিনশ্বর সৌন্দর্য্য বর্ণনায়,—গদ্য হইয়াও কাদম্বরী কাব্য পদবাচ্য হইয়া—জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আর কাদম্বরীর অনুকরণ হয় নাই, হইবেও না। কাদম্বরীর প্রেম প্রবণ ভাবের আভাবে অণুপ্রাণীত হইয়া—হতাশ প্রেমিক চন্দ্রশেখর, যুগযুগান্তর পরে—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম রচনা করিয়াছিলেন, তাই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গদ্য কাব্য; এক দীর্ঘ সমাস জনিত জটিলতার কলঙ্ক না থাকিলে, কাদম্বরী—প্রেমরাজ্যের শারদাকাশে—নির্ম্মল পূর্ণ শশধর! কাদম্বরীর সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য আমরা অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, কাদম্বরীর উদ্ভবক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কাদম্বরী আমাদের—প্রেমের পবিত্র নির্ম্মাল্য, কাদম্বরীর কবি—একজন নিপুণ চিত্রকর।